প্রকাশ : জানুয়ারি ১৩৬৭

দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯-এর পক্ষে
সুধাংশুশেখর দে কর্তৃক প্রকাশিত ও তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী,
কলকাতা ৬-এর পক্ষে নিশিকান্ত হাটই কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মরণে
প্রীতিভাজন শোভনা মিত্রের করকমলে

সূ চি প ত্র

প্রাগ্‌-উক্তি

এ-বইয়ের প্রায় সবটাই 'দেশ'-এর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। গৌরী আইয়ুবের "কবিজীবনী" অবশ্য ইতিপূর্বে কোথাও ছাপা হয়নি, এই বইয়ের সংযোজনরূপেই লেখা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করবার সময়ে 'দেশ'-এ প্রকাশিত অনুবাদ ভূমিকা ও উত্তরভাবে অনেকটা সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছি, কিছুটা বাদও দিতে হয়েছে। 'দেশ'-এ শের-এর সংখ্যা ছিলো ১০৫, এখানে দাঁড়িয়েছে ১২৮-এ।

গৌরী তো এ-বইয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেনই, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। স্বপন মজুমদার আবারো প্রকাশনার সমূহ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অক্ষরান্তরণ-নির্দেশিকা

স্বরবর্ণের উচ্চারণ সর্বত্র হিন্দির মতো হবে। বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর একইরকম উচ্চারিত হয়, হিন্দি এবং উর্দুতে তাদের মাত্রাভেদ স্পষ্ট। 'হৈ' উচ্চারিত হয় অনেকটা বাংলা 'হায়'-এর মতো, যদি অবশ্য এখানে া-টিকে খুব হ্রস্ব মাত্রা দেওয়া হয়; 'নৌ'-এর উচ্চারণ হবে বাংলা 'নও'-এর মতো; 'হট্' উচ্চারিত হবে ইংরেজি hut-এর মতো।

ব্যঞ্জনবর্ণে ফ়=f, ব়=v, ব=b, স=s, শ=sh, জ়=z, ..=s : যেমন measure-এ। 'য়' শব্দের গোড়াতে উচ্চারিত হয় ইংরেজি y-এর মতো, যেমন yard-এ। ক, খ, এবং গ দ্বারা যে-কণ্ঠধ্বনি বোঝাতে চেয়েছি তা না-শুনিয়ে বোঝানো যাবে না। ইংরেজি ভাষায় এরকম কোনো ধ্বনি নেই, কাজেই ইংরেজি বর্ণমালার সাহায্যও এখানে নিতে পারলাম না।

গালিবের গজল থেকে

ভূ মি কা

প্রথম পর্ব

আসাদুল্লাহ্ খাঁ গালিবের (১৭৯৭ – ১৮৬৯) বিভিন্ন সময়ে রচিত অনেকগুলি গজল থেকে কয়েকটি শের (couplet) বেছে নিয়ে এখানে আমার মনের মতন ক'রে সাজিয়েছি। পারম্পর্যের দোষগুণের দায়িত্ব অবশ্য আমারই। উদ্দেশ্য ছিলো এমন ক'রে সাজানো যাতে একটি শের-এর সাহায্যে আগের বা পরের শের-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে উর্দু কাব্যরীতির সঙ্গে অপরিচিত বাঙালী পাঠকের কিছু সুবিধা হয়। আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো। অনুবাদ তিন পর্বে ভাগ-করা। প্রত্যেকটি পর্বে আমি চেষ্টা করেছি কতকটা ধারাবাহিকতা আনতে, ভিন্ন-ভিন্ন গাছ থেকে তুলে-আনা ফুলগুলিকে একটি মালায় গাঁথতে। সূত্রটি অবশ্য অত্যন্ত ক্ষীণ, ছিঁড়ে গেছে দু-চার জায়গায়। তবে এর চেয়েও কম সংলগ্নতা কোনো-কোনো নামজাদা আধুনিক কবির কবিতায় লক্ষণীয়। তাই আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম ভাবতে পারি না।

মনে রাখা ভালো যে প্রায় কোনো গজলই পরিচিত অর্থে এমন-কি আধুনিক কবিতার নজীরেও একটি কবিতা নয়, পাঁচ-সাতটি বা পনেরো-কুড়িটি শের-এর সমষ্টি, কেবলমাত্র ছন্দ ও মিলের ঐক্যে একত্রিত ; ভাবের ঐক্য

না-থাকারই কথা, থাকাটা ব্যতিক্রম। শাস্ত্রমানা ধার্মিক ও ধর্মোপদেষ্টাকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, দার্শনিক তত্ত্বকথা, মরমিয়া রাহসিকতা, প্রিয়ার কোমল কান্তি এবং জল্লাদী নিষ্ঠুরতার বর্ণনা, নিজের কবিপুরুষ সম্বন্ধে অহংকার বা মৃদু ঠাট্টা—সবই একটি গজলে পাশাপাশি স্থান পেতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে দুই-পংক্তি-সংবলিত শেরই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। জাপানী হাইকুর কাছাকাছি, তবে তুলনায় একটু দীর্ঘ এবং বেশ-একটু জটিল। এই কাব্যকণিকাগুলির পরিসর অতিসীমিত ব'লে শব্দের চয়নে ও বিন্যাসে অতিশয় দক্ষতার প্রয়োজন বোধ করেছেন উর্দু শায়েররা। রসস্রষ্টা হোন আর না-ই হোন, রূপদক্ষ তাঁদের হ'তেই হয়।

আমার এ-গদ্য-অনুবাদ মূলানুগই, শাব্দিক না-হ'লেও খুব সন্নিকট। অবশ্য মূলের নিকটতর অনুসরণ যে সম্ভব ছিলো না তা নয়। তবে তা করতে গেলে মূল উর্দু কবিতার কাব্যিক মূল্য হারিয়ে যেতো আরো বেশি, অর্থাৎ যতোটা মূল্যক্ষয় অনুবাদমাত্রেই (পদ্য-অনুবাদেও) অনিবার্য তার চেয়ে অনেক বেশি। বরঞ্চ পদ্য-অনুবাদ মূল থেকে এবং মূলের মূল্য থেকে আরো দূরে স'রে যেতে বাধ্য। অনুবাদক যদি সুকবি হন, তবে ছন্দ-মিলের সৌষ্ঠবে নতুন-কিছু মূল্য সংযুক্ত হ'তে পারে ; কিন্তু সেটা সুদ-জাতীয় মুনাফা-লাভ, তাতে ক'রে কি আসলের ক্ষতিপূরণ হয় ?

পদ্য-অনুবাদ যে মূলের কতোখানি ক্ষতি করতে পারে তার চমকপ্রদ উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। "For God's sake, hold your tongue / And let me love"-এর অনুবাদ করেছেন "দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর, / ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।" মূলের প্রচণ্ড ধাক্কাটি একেবারে হারিয়ে গেছে। ইংরেজি শব্দ ক'টি পড়লেই সন্দেহ থাকে না যে রচয়িতা একজন শক্তিমান কবি; বাংলা পংক্তি দুটি যে-কোনো সাধারণ কবির হাত দিয়ে বেরুতে পারতো। দেবনিন্দা করছি, কী আস্পর্ধা আমার! তবে দেবতারা একটু-আধটু নিন্দা সইতে পারেন। অথবা ইকবালের ভাষায় বলি: "যে তোমার বন্দনা করতেই অভ্যস্ত, তার কাছ থেকে একটু অনুযোগও শুনে নাও ("খুগর-এ হম্দ্-সে থোড়াসা গিলা-ভি সুনলে") এই সূত্রে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি যে পদ্য-অনুবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও রবীন্দ্রনাথেই পেয়েছি। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র মতো রসোত্তীর্ণ ও মহত্ত্বপূর্ণ অনুবাদ দুটি-একটির বেশি কোথাও পাওয়া যাবে না ব'লে আমার বিশ্বাস। ব্যক্তিগতভাবে আমি কেবলমাত্র রিল্‌কের 'ডুইনো এলেজীস্'-এর ইংরেজি অনুবাদে (অনুবাদক স্পেণ্ডর এবং লাইশমান) তুলনীয় আনন্দ বোধ করেছি।

আমার এ-পদ্য-অনুবাদ কোনোমতেই আদর্শ অনুবাদ নয়; তবে মনে কীধরনের আদর্শ ছিলো সে-বিষয়ে কিছু

বল; নয়কার। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি উর্দু শের-শায়েরির খানিকটা স্বাদ বাঙালী পাঠকের রসনায় পৌঁছিয়ে দিতে। এবং দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করেছি যাতে পাঠক সম্যক উপলব্ধি না-করলেও অনেকটা ধারণা করতে পারেন যে গালিব একজন উঁচুদরের কবি — উঁচুদরের ভাবুক ও শব্দশিল্পী।

দু-চার জায়গায় স্বাধীনতা নিতে হয়েছে মূলতর কারণেও — কখনো কোনো কেন্দ্রস্থভাবব্যঞ্জক অতি সুন্দর উর্দু শব্দের (যথা তমন্না, হসরৎ, বহশৎ, নাজ, নিয়াজ, শোখী ইত্যাদি) বাংলা প্রতিশব্দ বা তার খুব কাছাকাছি কোনো সন্তোষজনক শব্দ খুঁজে না-পেয়ে; কখনো কোনো পংক্তির দুর্জ্ঞেয়তার দ্বারা বাধ্য হ'য়ে। গালিব উর্দু ভাষার দুরূহতম কবি, মুশকিল-পসন্দ্ (দুরূহতাপ্রিয়) এবং মুহ্‌মিল-গো (প্রলাপ-বকিয়ে বা হালের ভাষায় poet of nonsense) ব'লে তাঁর অপখ্যাতি ছিলো — বিশেষত যৌবনকালে। এক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক বন্ধুর পরামর্শে তিনি সে-সময়কার রচনা থেকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। তবু পরবর্তী প্রৌঢ় কাব্যে এ-অভ্যাস যেতে-যেতেও একেবারে যায়নি। কোথাও-বা প্রথম পাঠে দুর্বোধ ঠেকে অতি-সংক্ষেপের দরুন, মনে হয় যেন কোনো শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ ছেঁটে ফেলা হয়েছে ইচ্ছা ক'রেই, পাঠক সে-শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ ক'রে নেবেন নিজের বুদ্ধি ও রসবোধকে সক্রিয় রেখে — এই ভরসায় হয়তো।

যেমন ধরুন : "তমাশা-এ গুলশন, তমন্না-এ চীদন / বহার-আফ্রীনা, গুনাহ্‌গার হৈঁ হম।" শাব্দিক অনুবাদ হবে : "ফুলবাগিচার দৃশ্যাবলোকন, চয়নের আকাঙ্ক্ষা / বসন্তের স্রষ্টা, আমি পাপী।" প্রথম পংক্তিটাকে সুগম ক'রে নেওয়ার জন্য আমি অনুবাদ করেছি : "ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই।" "আমি পাপী" কারণ দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ বাসনাকে মনে স্থান দিয়েছি। ঈষৎ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গার্থ— আমি কবি, আমি দ্রষ্টা, আমার উচিৎ নয় বিশ্বের এই সুন্দর বাগান থেকে একটি ফুল, ফুলের মতো একটি মেয়ে, বা যে-কোনো জিনিষকে কাছে টেনে নিয়ে একান্ত নিজের সম্ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। অথচ আমি পোষণ করি। আমি-যে প্রেমিক, শুধু জগৎ-প্রেমিক নই, নারী-প্রেমিকও বটে। এবং যে-নারী আমার হৃদয়ের অধিশ্বরী, আমি চাই তার হৃদয়মনপ্রাণের একাধীশ্বর হ'তে। হে সুন্দরের দেবতা, হে সুন্দর জগৎ, আমি গুনাহ্‌গার। মনে প'ড়ে যায় একটি পরিচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম দুটি পংক্তি :

> "চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি,
> চেয়ো না, চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।"

বিষয়ের ঐক্য সত্বেও অনুভূতি এবং ভাববিন্যাসের প্রভেদ লক্ষণীয়। অবশ্য গালিবের কাব্য-সংকলনে সহজ সরল

শের-এর সংখ্যাও খুব কম নয়। এবং যেখানে মাথা খাটিয়ে অর্থোদ্ধার করতে হয় সেখানেও আমরা কবির রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

হাফিজে যেমন, রবীন্দ্রনাথে যেমন, গালিবেও তেমনি নারীপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়, পথ সুগম। তবে গালিব যেখানে নারীপ্রেমের কথাই বলছেন সেখানে তাঁর ভাব ও ভাষা মাটির অনেক বেশি কাছাকাছি, পাঠকের সঙ্গে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ; নিজেকে ছোটো ক'রে এমন-কি হাস্যকর ক'রে দেখাতেও তাঁর সংকোচ নেই। গুরুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে হালকা কৌতুকরসের আমেজ তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ঘটাতে পেরেছেন। অনবদমিত অনবগুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ সাধারণভাবে উর্দু কবিদের বৈশিষ্ট্য; গালিব তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট।

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম শেরটি ("আহত চোখের নৈরাশ্যের মহিমা জানে না আকাশ ; / হেমন্তহীন বসন্ত বিকল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নেয়" ।) কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ব্যঞ্জনা গভীর এবং বিস্তীর্ণ, এতোখানি ব্যঞ্জনাশক্তি মাত্র কয়েকটি শব্দকে দান করার চেষ্টা নিশ্চয় প্রশংসনীয়, সফল হ'লে সমাদরণীয়। তবে সে-সাফল্য কতক পরিমাণে নির্ভর করে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতার উপর, নিষ্ক্রিয় সংবেদনশীলতা যথেষ্ট নয়।

চোখ এখানে সবক-টি ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, উপরন্তু সেই মনেরও প্রতীক যে-মন ইন্দ্রিয়বাহিত বার্তা গ্রহণ করে, সংগৃহীত করে, এবং একটি সুসমঞ্জস অর্থশৃঙ্খলা রচনা করে। আমরা যখন জগতের দিকে — বিশেষত মানবজগতের দিকে — তাকাই তখন এমন অনেক-কিছু প্রত্যক্ষ করি যা কুৎসিত কদর্য ও বীভৎস। আরো পীড়িত বোধ করি অদূর ভবিষ্যতে কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও প্রতিকারের কোনো পথ দেখতে না-পেয়ে। এই পরিব্যাপ্ত অমঙ্গল কি তবে চিরন্তন ? নৈরাশ্যে মন ভ'রে ওঠে — বিশেষত কবির মন, যাঁর পরিশীলিত সংবেদনা অতি প্রখর। সব কবির কথা বলছি না, তবে গালিবের মন

এমনই এক নৈরাশ্যবাদী ছাঁচে ঢালাই করা ছিলো। দুঃখ-সাধনায় তিনি যেন এক প্রকার অবচেতন আনন্দ পেতেন।

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হ'লে চারিদিককার ঘনান্ধকারে আমরা কোনো ভূগর্ভস্থ নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীতে পরিণত হতাম। কিন্তু গালিব বলছেন এই নৈরাশ্যের মধ্যে একটা মানবিক মহিমা আছে যার তুলনা জড়জগতে কোথাও নেই। নৈরাশ্য জাগে প্রত্যাশা ও প্রত্যক্ষের, আদর্শ ও তথ্যের সংঘাতে ("Between the idea / And the reality / Falls the shadow")। আমরা চৈতন্যবিশিষ্ট জীব হিসাবে শুধু প্রত্যক্ষ করি না, প্রত্যক্ষ বিষয়ের নৈতিক ও নান্দনিক মূল্য বিচারও করি। সে-বিচারের মূল্যমান অতিশয় উচ্চ। এ-ও কি নিয়মবদ্ধ জড়প্রকৃতির দান? ভাবতে গেলে ধাঁধা লাগে। সে যা-ই হোক, এই মূল্যবোধই, এই-যে আমরা সারা দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার যদি কোনো পরম স্রষ্টা বা বিধাতা থাকেন তবে তাঁকেও ধিক্কার দিচ্ছি ("আমার মুখে ছাই কিন্তু তুমিও তো মাতাল, হে ভগবান" : উমর খৈয়াম), সে-ধিক্কারই আমাদের মহিমান্বিত ক'রে তোলে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে।

দ্বিতীয় পংক্তিতে "হেমন্তহীন বসন্ত" পরোৎকর্ষের (perfection-এর) কাব্যিক ভাষান্তর। আমাদের আহত দৃষ্টির ঘন নৈরাশ্য এমন একটি দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পায়

যার লেশমাত্র কার্যকারিতা গালিব কোথাও দেখতে পান না। তবু, জোর দিয়ে বলেছেন—এই ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসই ('আহ্-এ বেতাসীর') পরোৎকর্ষের আভায় বিভু। Perfection-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'পূর্ণতা'ও হ'তে পারে; রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় 'সুন্দর' শব্দটি এ-অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'শাপমোচন'-এর কুরূপ রাজা বলেছেন, "অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।" রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরম বেদনার (দীর্ঘশ্বাসের) ব্যর্থতার উপর জোর দিচ্ছেন না। সুন্দরের আহ্বান আমাদের সৌন্দর্য-সাধনায় প্রবৃত্ত করতে পারে, সে-সাধনা অন্তত অল্পাংশে সফল হ'তে পারে।

সৌন্দর্য-সাধনার মানে এখানে কেবল শিল্প-রচনাই নয়, বরঞ্চ বৃহত্তর অর্থে জীবন-রচনা। গান্ধী একবার বলেছিলেন - আমার জীবনই আমার কবিতা। কোন্ কবির কোন্ কবিতা এমন বিচিত্র উপাদানে সুসমৃদ্ধ, এমন বিভিন্ন ভাবনায় বেদনায় এষণায় ঐকতান? গান্ধী চেয়েছিলেন প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু মোচন করতে। সে-সাধনায় তিনি ব্যর্থ হলেন। তবু এই ব্যর্থতার মধ্যেই রচিত হ'লো তাঁর আপন জীবনের অপূর্ব কবিতা—কত ধৈর্যে, কত যত্নে, কত আত্মনিপীড়নে, কত আঘাতে-সংঘাতে তা আমরা সবাই জানি।

কবিতা অথবা সাধারণভাবে শিল্প-রচনার মূল্যকেই যাঁরা পরম এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব'লে ঘোষণা করেন,

তাঁদের কথা আমি ঠিক বুঝি না। তাঁরা কেন ভুলে যান যে জ্ঞানীও তাঁদের নিকট-আত্মীয়; কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক একটু দূরের হ'লেও খুব বেশি দূরের নয়। এঁদের সকলের অন্তঃপ্রেরণা একই। এঁরা চলেছেন ভিন্ন পথে একই আহ্বানে সাড়া দিয়ে— অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। প্রত্যক্ষে চিন্তায় কল্পনায় অনুভূতিতে কর্মে জীবনচর্যায় বিশৃঙ্খলাই তো অসুন্দর।

ছবি দেখার জন্য চোখ তৈরী করতে হয় যেমন, গান শুনবার জন্য কান তৈরী করতে হয় যেমন, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের – বিশেষত পদার্থ- ও জীব-বিজ্ঞানের সৌন্দর্যস্বরূপ দেখার জন্য মন তৈরী করতে হয়। রীতিমতো বিজ্ঞানচর্চা আবশ্যক নয়, সেটা অনেকের পক্ষে সম্ভবও নয়; তবে যে-কবি প্রথম থেকেই মনের অনেকগুলি দরজা-জানালায় খিল দিয়ে রাখেন, তিনি নিজের এবং অনুরাগী পাঠকদের পূর্ণবিকাশের সম্ভাবনাকে খর্ব করেন।

বিজ্ঞান-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিলো যৌবনকাল থেকেই, জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তার অন্যতম প্রমাণ। এ-সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত ছিলো না, ভাবগতও ছিলো। তখন রবীন্দ্রনাথের মনে স্থান পেয়েছিলো প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান। সত্তর পেরিয়ে তিনি নবপদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হলেন— বিশেষত তার সবচেয়ে রোমান্টিক শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে। প্রখ্যাত কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানীর অগাণিতিক

ভাষায় লেখা বই অধ্যয়ন করলেন, ফলে আমরা একটি মূল্যবান গ্রন্থ—'বিশ্বপরিচয়'—পেলাম। কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান জিনিষ পেলাম—বিজ্ঞান-ভিত্তিক কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা, যার অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে 'নবজাতক'-এ। চিন্তাগর্ভ অবশ্যই, তবে চিন্তাতীতের স্পর্শ তাতে লেগেছে নিঃসন্দেহে। বিজ্ঞান আমাদের কাজে লাগে, সেটা তার একটা দিক ; মহত্তর দিক হচ্ছে যে তা আমাদের মনশ্চক্ষুকে উদ্ভাসিত করে, মানসিক রসবোধকে তৃপ্ত করে। বিজ্ঞানের এই নান্দনিক আয়তন রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন এবং কবিতার সঙ্গে তার মিতালি ঘটাতে পেরেছিলেন। সুন্দরের একটি প্রকাশ যেমন বিজ্ঞানীর গবেষণায়, তেমনি তার আর-একটি প্রকাশ গান্ধীর মতন মহাপুরুষের চারিত্র্যে।

গালিবে ফেরা যাক। মানবজীবনের দুঃখ দৈন্য পরাজয় হতাশা যে কতো তীব্র ও পরিব্যাপ্ত সে-বিষয়ে গালিব খুবই সচেতন, এতই সচেতন যে কখনো-কখনো বলেছেন—তাঁর কণ্ঠে কোনো সঙ্গীত নেই, আছে শুধু পরাজয়ে ভেঙে পড়ার একটি আওয়াজ। তবে এটাই তাঁর শেষ কথা নয়। অমঙ্গল থেকে উত্তরণের দুটি উপায় তাঁর জানা ছিলো। প্রথমত, গভীরতম ট্র্যাজেডির মধ্যে কমেডি আবিষ্কার, করুণরসের সঙ্গে হাস্যরস বা কৌতুকরস মিশিয়ে দেওয়ার রাসায়নিক দক্ষতা। দ্বিতীয় উপায়—জাগতিক অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করার শক্তি-সাধনা (শের ৩৬)।

প্রথম উপায়-অবলম্বনে গালিবের সাফল্য অবিসম্বাদিত এবং অতুল্য। দ্বিতীয় উপায়টি র'য়ে গেলো সাধনারূপে— স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার সাধনা। এমন-কি, এ-সাধনাও তিনি খুব ওয়িষ্ঠভাবে করেছিলেন ব'লে তো মনে হয় না। অন্তত স্বল্পমাত্র সিদ্ধিলাভেরও কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না তাঁর কাব্যে, ব্যর্থতার সাক্ষ্যই সেখানে প্রচুর। এই ব্যর্থতা তাঁর জীবনকে কিঞ্চিৎ অসুন্দর এবং কাব্যকে অতিশয় সুন্দর করেছে। মোটের উপর গালিব ছিলেন বিশুদ্ধ কবি, অর্থাৎ ধ্যানী মানুষ।

পক্ষান্তরে, ইকবাল মানবজীবনের সব দুঃখকে গ্রহণ করেছেন একটি চ্যালেঞ্জরূপে। নিস্তরঙ্গ জীবনকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন : "ঈশ্বর তোমাকে কোনো তুফানের মুখোমুখি ক'রে দিন, / তোমার সাগরের ঢেউয়ে উত্তালতা নেই।" আরো বলেছেন "সঙ্কটপ্রিয় মন (সেটাই কবির প্রশংসিত মন) এমন বাগান ভালোবাসে না যেখানে ব্যাধ ওৎ পেতে নেই।" নীট্‌শের live dangerously উপদেশটা মনে প'ড়ে যায়। ইকবাল সচেতনভাবেই নীট্‌শের প্রভাব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে। তেমনি সচেতনভাবে তিনি তাঁর কাব্যকে নীতিশিক্ষাবাহী (ডাইড্যাক্‌টিক) করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর বিশ্বাস প্রত্যেক সার্থক কবি একজন ছোটোখাটো পয়গম্বর, আল্লার বাণী মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব কবির উপরেও ন্যস্ত। ইকবাল যেখানে সামাজিক দুর্দশা ও

অমঙ্গলের চিত্র এঁকেছেন সেখানে একটি মঙ্গললোকের কল্পচিত্রও তাঁর মনশ্চক্ষের সামনে উপস্থিত। সাধারণভাবে তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে যাত্রা করবার শক্তি সঞ্চয় করা এবং পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা। তাঁর সর্বজনবিদিত কবিতার ("চীন ও অরব হমারা, হিন্দোস্তাঁ হমারা") শেষ পংক্তিতে নিজের রচনাকে সেই তূর্য-ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছেন যার ডাক শুনে কাফেলা আবার রওয়ানা হয় মরুভূমির বিপদসঙ্কুল পথে।

তবে গালিবের কাব্যে কর্মী মানুষের জন্য কোনো প্রেরণা নেই বললে একটু ভুল বলা হবে; আছে, কিন্তু সূক্ষ্মতরভাবে এবং বস্তুতান্ত্রিক ভাষায়। তাঁর একটি সুন্দর পারসী শের এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "জিজ্ঞাসা করলাম – 'একটি ধূলিকণার পক্ষে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছানো কি সম্ভব?' সে বললো – 'অসম্ভব প্রায়।' / জিজ্ঞাসা করলাম – 'তবু কি আমি চেষ্টা ক'রে যাবো?' সে বললো – 'তাই সঙ্গত'।" ধর্মবিষয়েও গালিবের মত সত্যসাধনার পথ দেখিয়ে দেয়; সমস্ত আচার-বিচার এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে ওঠার নির্দেশ রয়েছে তাঁর কাব্যে: "আমি একেশ্বরবাদী, সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করাই আমার নীতি / ধর্মসম্প্রদায়গুলি লুপ্ত হ'লে সত্যধর্মের উপাদান হ'য়ে যাবে।"

আর-একটি লক্ষণীয় প্রতিতুলনা এই যে ইকবাল ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন কবি, তাঁর শ্রেষ্ঠ উর্দু কাব্যের

('শিক্ওয়াহ্') বিষয় মুসলিম সমাজের উত্থান ও পতন। মুসলিম অভ্যুদয়ের প্রথম তিন চার শতকের গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাসের চিত্রের পাশাপাশি তুলে ধরছেন বর্তমানকালে সারা পৃথিবীর মুসলিম সমাজের অধঃপতন লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ধূলিমলিন চিত্র। অন্যদিকে ঈর্ষান্বিত তুলি দিয়ে রেখাঙ্কিত করছেন আধুনিক ইয়োরোপের সরস্বতী ও লক্ষ্মী-লাভের অধ্যায়টি। আল্লাহ্ যেন মুসলিম সমাজের উপর থেকে তাঁর সমূহ করুণা ও প্রীতি প্রত্যাহার ক'রে অকৃপণ হস্তে দান করেছেন পশ্চিম ইয়োরোপের নবজাগ্রত রাষ্ট্রগুলিকে। আল্লাহ্কে দত্তাপহারী বলতে পারতেন, কিন্তু এতো মামুলী কথা বলবার মতো কবি নন ইকবাল। বলছেন দারুণতর কথা।

ইকবালের 'শিক্ওয়াহ্' বা 'অনুযোগ' পুঞ্জীভূত হয়েছে দুটি চমকপ্রদ দুঃসাহসিক পংক্তিতে – "কভী হম্‌সে কভী গৈরোঁসে শনাসায়ী হৈ, / বাত কহনে কী নহী – তূ ভী তো হরজাঈ হৈ।" ("কখনও আমাদের সঙ্গে কখনো অন্যদের সঙ্গে তোমার ভাব, / কথাটা মুখে আনতে নেই – তুমিও তো হরজাঈ"।) 'হরজাঈ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'সর্বব্যাপী ও 'সর্বত্রগামী', কিন্তু চলতি ভাষায় কথাটা 'বহু পুরুষের শয্যাগামিনী' অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এই আশ্চর্য স্পর্ধা নারীপ্রেমের বেলায় যেমন ঈশ্বরপ্রেমের বেলাতেও তেমনি উর্দু কাব্যে "শোখী" নামে ঐতিহ্যসম্মত ও সুধীজন-অনুমোদিত। সাধারণভাবে মুসলিম

সম্প্রদায়কে ধর্মপ্রসঙ্গে খুব সহিষ্ণু বলা যায় না। কোনো ইতিহাসের বইতে হজরৎ মুহম্মদের রেখাচিত্র মুদ্রিত হ'লে কিংবা তাঁর কথা বলতে গিয়ে সামান্যতম অসম্মানসূচক বাক্য কেউ উচ্চারণ করলে খুনখারাবির ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। অথচ যিনি স্বয়ং আল্লাহ্ ত' আলাকে 'হরজাঈ' বললেন তিনি কোথাও কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন ব'লে তো শুনিনি।

গালিবের কবিতাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা যায় এবং সে-ব্যক্তি কবি স্বয়ং। তবু সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ব'লে গালিবকে তাচ্ছিল্য করা যায় না। প্রায় সর্বত্রই তিনি নিজেকে এঁকেছেন অত্যন্ত সাধারণ রক্তমাংসের মানুষরূপে, এমন লক্ষ কামনা-বাসনায় পীড়িত যার অত্যধিক অংশই. বাস্তবিক সম্ভাব্যতার সীমানা ছাড়িয়ে। এ-কথা তাঁর জানা আছে তবু সাধারণ মানুষের মতো তিনিও চাঁদের পানে হাত বাড়ান এবং নাগাল না-পেলে নিজের হতবিধিকে অভিসম্পাত দেন। তাই গালিব যখন একান্ত নিজের পরাজিত পর্যুদস্ত যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের কথা বলেন তখন পরোক্ষে তিনি সব সাধারণ মানুষের দুঃখের কথাই বলছেন।

অধিকাংশ সমালোচক ও সাহিত্যরসিকের মতে উর্দু ভাষার দুই শ্রেষ্ঠ কবি গালিব ও ইকবাল। অনেক দিক থেকে এই কবিদ্বয় প্রায় বিপরীতধর্মী ; তবে একটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তাঁদের কাব্যসৃষ্টির

একটি বড়ো ভাগ — কারো-কারো মতে, এবং সম্ভবত দুই কবির মতেও, শ্রেষ্ঠ ভাগ — রচিত হয়েছে ফারসী ভাষায়। গালিব ১৫/১৬ বছর বয়সে কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন, এবং স্বভাবতই তখন তাঁর মাতৃভাষা উর্দুতেই কবিতা লিখতেন। কিন্তু ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮২৭ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত) তিনি ফারসী ভাষাকেই আত্মপ্রকাশের মূল বাহন করেছিলেন।

উর্দু ভাষায় প্রত্যাবর্তন ঘটে প্রধানত দুটি কারণে। তিনি দেখলেন যে তাঁর অবহেলিত উর্দু ভাষার গজলগুলিই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, বয়স যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি তখন দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ; এবং ঐ-সময়ে জওকের মৃত্যুর পর তিনি রাষ্ট্রকবি (শায়েরুল-মুল্‌ক) পদে বহাল হলেন। বাহাদুর শাহ জফর নিজে উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতেন। অনেকটা তাঁরই প্ররোচনায় গালিব ফারসী ছেড়ে উর্দুর দিকে পুনরায় মনোযোগী হলেন।

তবে প্রথম বয়সে এবং শেষ বয়সে তাঁর কাব্যের বাহন উর্দু হ'লেও সেটা এক অভিনব উর্দু। তিনি শুধু যে বহুল পরিমাণে ফারসী শব্দ ব্যবহার করতেন তাই নয়, অন্য কয়েকজন কবিও তা করেছেন। গালিব তাঁর উর্দু কবিতায় ফারসী শব্দবন্ধ, বাক্‌রীতি, অব্যয়াদি অবলীলাক্রমে টেনে এনেছেন। ফলে তাঁর রচনা প্রায়শঃই ভিন্‌দেশীয় গন্ধে মৃদু-সুরভিত। আমরা অনেকে সাহিত্য

বা অন্য-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার সময়ে যেমন নির্মমভাবে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশ মেশাই, তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। উর্দুর সঙ্গে ফারসী ভাষার প্রাণের মিল অনেক বেশি। তাই স্বীকার করতে দোষ নেই যে কবি গালিবের উর্দু চলিত উর্দু নয়, একপ্রকার মিশ্রিত কিন্তু শক্তিশালী ভাষা যা তাঁরই সৃষ্টি এবং বৈশিষ্ট্য। 'কবি গালিব' বলছি এইজন্য যে উর্দু গদ্যের ইতিহাসে গালিবের অবদান সকলের স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেছে। রামমোহনের মতো তাঁকে গদ্যের স্রষ্টা বলা যায় না, উর্দু গদ্য আরো প্রাচীন। তবে গালিব উর্দু গদ্যকে আশ্চর্য গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। অনেকের মতে তিনি আধুনিক উর্দু গদ্যের জন্মদাতা।

আমার অনূদিত শেরগুলি গালিবের উর্দু গজল থেকেই সংকলিত। কেবল একটি শের ফারসী থেকে নেওয়া : "আমার নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে কালের গতি রুদ্ধ, / যার দিনগুলি নিশকালো তার প্রভাতই বা কী, সন্ধ্যাই বা কী!"

তৃতীয় পর্ব

সঙ্কয়নের তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয় শেরটি ("খাঁচার মধ্যে বন্দী আমাকে সব খবর শোনাতে দ্বিধা কোরো না, সখা ; / কাল যার উপর বাজ পড়লো তা আমারই বাসা হ'তে যাবে কেন ?") একজন সমালোচকের মতে গালিবের শ্রেষ্ঠ শের। আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই, তবে শেরটি যে অতীব সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। খুব ছোটো একটি গল্প যেন এই দুটি পংক্তির মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে।

গুল ও বুলবুল উর্দু কাব্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের গতানুগতিক প্রতীক — ফুল উদাসীন বা নিষ্ঠুর প্রিয়া, গীতিরত বুলবুলের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন প্রেমিক-কবি। বসন্তকালে গোলাপ ফুল ফুটেছে বাগানে, কোনো-একটিকে বেছে নিয়ে বুলবুল তার প্রেমে পড়েছে, মনের হর্ষ-বেদনা — বেদনার মাত্রাই অধিক — মধুর কণ্ঠে জানাচ্ছে। বুলবুলের পাগলামি দেখে ফুল শুধু হাসে। এই তিক্ত-মধুর দ্বিরালাপের মাঝখানে নিষ্ঠুর জগৎ প্রবেশ করে সৈয়াদ বা ব্যাধরূপে। জাগতিক অশুভ শক্তির একটি প্রতীক ব্যাধ, আর-একটি প্রতীক বজ্রবিদ্যুৎ।

আলোচ্য শের-এ বুলবুলিটি ধরা পড়েছে, খাঁচার মধ্যে বন্দী হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে। আগের দিনের প্রতিবেশী

অন্ত-একটি বুলবুলি এসে জানালার পাশে কোনো গাছের ডালে ব'সে বাগানের সব খবর দিচ্ছে তার দুর্ভাগা বন্ধুকে। প্রসঙ্গক্রমে বাজ পড়ার কথাটা ব'লে ফেলে সে থেমে গেলো। কেমন ক'রে সে জানাবে যে তার বন্ধুর বাসাখানি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। বন্দী বুলবুল যে কিছুই আঁচ করতে পারেনি তা নয়। তবে যেন অনেকটা নিজেকেই ভোলাবার জন্য বলছে—"থামলে কেন, সখা? বাগানের সব বৃত্তান্ত আমাকে শোনাও; কাল বাজ পড়েছিলো তাতে কি? বাগানে তো অনেক গাছ আছে, অনেক পাখীর বাসা আছে; তার মধ্যে বেছে-বেছে বাজ আমারই বাসার উপর পড়তে যাবে কেন?"

কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ আমারই সর্বনাশ ঘটাবার জন্য বিশেষরূপে তৎপর। অন্তত গালিবের কবিতায় এ-কথা বার-বার বলা হয়েছে। প্রথম পর্বের সঙ্কয়নের একটি শের উদ্ধৃত করি: "খুশি হবার কী আছে আমার খেতের উপর যদি একশ'বারও মেঘ আসে, / আমি তো জানি বিদ্যুৎ এখন থেকেই আমার ধানের গোলার ঠিকানা খুঁজছে।"—আমার সমস্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফসল নষ্ট করবার জন্য। (তুলনীয়: "আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি / অভিশাপ গেল লেখি"।)

তৃতীয় শের-এ খাঁচার কোণে ব'সে সুখে থাকার কথাটা ব্যাজস্তুতি। দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদের সম্মুখীন না-হ'লে জীবনে কোনো মহৎ জিনিষ পাওয়া যায় না সেটা

গালিবের ভালোভাবেই জানা ছিলো। পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্থ শের-এর গোলাপফুল নিকটবর্তী বাগানের ফুল আর নয়, চ'লে গেছে অনেক দূরে, জগৎ-পারাবারের অপর তীরে। কোনো বুলবুলির পক্ষে সেখানে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুদূরের জন্য তার বুকভরা পিপাসা এখন বিষণ্ণ, ক্লান্ত, নৈরাশ্যভারে ক্লিষ্ট :

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি।"

গোলাপ ফুলের প্রতীকী সত্তা এখন শুধু রক্তমাংসের সুন্দরী প্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে না, ইঙ্গিত করছে, অধরা পরিপূর্ণতা বা পরম সুন্দরের দিকেও ; অন্তবিহীন পথ পার হ'তে হবে তার কাছে পৌঁছতে গেলে।
রবীন্দ্রনাথের গানে বিপুল সুদূরের আহ্বান বেশি শোনা যায় ; গালিবের শের-এ কেটে-ফেলা পালকের জন্য বেদনা বেশি ফোটে। গালিবও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারতেন : "তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, / এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।" কিন্তু তিনি বলছেন ভিন্ন কথা : "আমি সৈয়াদের প্রেমে প'ড়েই বন্দী হ'য়ে আছি, / নইলে উড়বার শক্তি এখনও রয়েছে আমার ডানায়।" গালিব কি তাঁর সমসাময়িক ফরাসী কবি বোদলেয়রের

মতন অমঙ্গল-প্রেমিক ছিলেন? দুঃখ-প্রেমিক তো ছিলেনই।

অন্যান্য উর্দু কবির মতোই গালিব প্রিয়ার নিষ্ঠুরতার কথা বলেছেন অনেকবার। কিন্তু সবচেয়ে নিদারুণ দুঃখ প্রিয়ার নিষ্ঠুরতা নয়, প্রিয়ার (নাকি পরমপ্রিয়ের?) সম্পূর্ণ উদাসীনতা, নিরেট বধিরতা; কোনো আর্তনাদ, কোনো প্রার্থনা, কোনো সম্ভাষণ পৌঁছোয় না সেখানে ("ওদিকে তুমি — এক পরমাশ্চর্য না-শোনা।" শের ১০)। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে এই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখি; ভাবটি আরও গভীর ও কাতর হ'য়ে উঠেছে শেষ পর্বের কোনো-কোনো কবিতায়: "বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর, / ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।" গালিবের একাধিক শের-এ এই নৈরাশ্যবিধুর বিষাদঘন মিনতি ব্যক্ত হয়েছে — যদি আর-কোনো সম্পর্ক না-থাকে তবে শত্রুতাই থাক, অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতাই চলুক (শের ৩১); তবু তো নিজেকে ভোলাতে পারবো যে তোমার নির্মমতার তলায় সামান্যতম মমতা লুকানো আছে; অন্তত নিজেকে বোঝাতে পারবো যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওনি। যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হ'য়ে গেলে আত্মপ্রতারণাও অসম্ভব হ'য়ে উঠবে (শের ১১)।

কিন্তু পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক কাব্য-সমালোচকদের প্রিয় বচন হ'লেও কাব্যের হন্তারক।

কবিকে কোনো-না-কোনো প্রকারের যোগসূত্র খুঁজে বার করতেই হবে। পারলৌকিক ভগবান বা দার্শনিক পরমসত্তা সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানের অগোচর, সমূহ ধ্যানধারণার অতীত হ'লেও এই শতশোভাময় দৃশ্যজগৎ তো রয়েছে সামনেই চোখ তুলে চাইবার অপেক্ষায়; তার রূপবিরূপের বৈচিত্র্য, সাদায়-কালোয়-মেশা বর্ণ-সংযোজনার মহান, হয়তো-বা ট্র্যাজিক, সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ এবং দেখিয়ে সার্থক হবেন কবি, নইলে তিনি কবি কিসের? (শের ১৫, ১৬, ১৭।)

আর ঈশ্বরপ্রেম যদি-বা শূন্যতাবোধে গিয়ে ঠেকে, তবু নারীর প্রতি ভালোবাসা তো এক বিপুল অনুভূতি-সমুদ্র। এ-ভালোবাসাও যদি ব্যর্থ হয়, কোনো সাধ যদি না-মেটে, কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি না-পুরায়, তবু প্রেমানুভূতির তো একটি রূপ আছে— একটি কেন, নিত্যনব রূপ আছে— সে-ও এক পরম বিস্ময়। এই অন্তর্দর্শনের আনন্দ— যাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ রসানন্দ - কবি ভাগ ক'রে নিতে পারেন পাঠকের সঙ্গে (শের ৩০)।

গালিবের নারীপ্রেমের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের নারী-প্রেমের প্রকৃতি থেকে বেশ-একটু আলাদা: মাংসলতর ও বলিষ্ঠতর এবং অনবদমিত; কিন্তু তেমন গভীর, তেমন সূক্ষ্ম, তেমন বর্ণবিভু নয়। মাঝে-মাঝে নিজের প্রেমকে পরিহাসের বিষয় করেছেন গালিব (শের ২৫, ২৬)। ভাবাবেশের অবকাশ খুব-একটা নেই তাঁর নারীপ্রেমের

কবিতায় ; পরিবর্তে আমরা পাই বিপরীত রস—ইংরেজিতে যাকে বলে উইট্। পরিস্থিতিভেদও ছিলো অনেকখানি। গালিবের প্রেমকাণ্ডের নায়িকা ছিলেন মহানগরের একজন (হয়তো-বা পরম্পরায় একাধিকজন) সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নৃত্যগীত-পটিয়সী, দেহ-ব্যবসায়িনী না-হ'লেও বহু প্রেমিকপরিবৃতা, সুশিক্ষিতা না-হ'লেও বাক্‌ভূষণে সুসজ্জিতা, সংলাপে সুচতুরা। পক্ষান্তরে যে দুই মহীয়সী নারীর আসন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ও গানে সুবিস্তৃত তাঁরা একেবারে ভিন্ন জগতের মানুষ, যে-ভাব-সাগরে তাঁরা ঢেউ তুলেছিলেন তা খুবই ভিন্ন জাতের। স্বভাবতই দুই কবির পার্থিব প্রেমের প্রতিবিম্ব, সৃষ্টিশীল প্রতিবিম্ব, পড়েছে তাঁদের অপার্থিব প্রেমের উপর। সহজেই অনুমান করা যায় যে গালিবের ঈশ্বরভাবনা ও ঈশ্বরপ্রেম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় যতোটা, প্রতিতুলনীয় তার চেয়ে কম হবে না। এ-প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ আলোচনা-সাপেক্ষ।*

* "উত্তরভাষ" দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ

প্রথম পর্ব

১

দুনিয়ার এই ভয়ানক উজাড় মজলিসে প্রদীপের মতো আমি
প্রেমের শিখাকেই আমার সর্বস্ব জ্ঞান করলাম ॥



২

ঘর গড়ে আর নগর উজাড় করে যে-প্রেম তাতেই অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা ;
মজলিস নিরালোক যদি ধানের গোলায় বজ্রপাত অগ্নিকাণ্ড না-ঘটায় ॥



৩

সর্বনাশের স্ফুলিঙ্গ তুমি, মানুষের ঘর উজাড় করতে একাই কম কিসে ?
তুমি যার বন্ধু হ'লে, আকাশ আবার তারও শত্রু হ'তে চায় কেন ?



৪

খুশির কী আছে ক্ষেতের উপর যদি একশ'বারও মেঘ আসে ;
আমি তো জানি এখন থেকেই বিদ্যুৎ খুঁজছে আমার ধানের গোলার ঠিকানা ॥

৫

আমি কী এমন জ্ঞানী ছিলাম, কোন্ গুণেই-বা সেরা ছিলাম
অকারণে, গালিব, আসমান আমার শত্রু হ'লো ॥



আকাশের দিকে তাকালে তার কথাই মনে আসে, আসাদ ,
তার নিষ্ঠুরতায় আমি যে দেখেছি বিধাতার নিষ্ঠুরতার আদল



৭

প্রেমের নিষ্ঠুরতাকে ভয় করি না, কিন্তু আসাদ
যে-হৃদয় নিয়ে গর্ব ছিলো, সে-হৃদয় আর নেই ।



৮

সে-মিলন আর সে-বিচ্ছেদ কোথায় ?
সেই রাত, দিন, মাস, বৎসর কোথায় ?

৯

পেয়েছিলাম বিশেষ একজনের রূপের ধ্যানে·
মনের সেই সরসতা আজ কোথায় ?



১০

প্রেমের উপর জোর খাটে না , এ সেই আগুন, গালিব,
যা জ্বালালে জ্বলে না, নেভালে নেভে না ॥



১১

আপনার উদাসীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে ; হে মহীয়সী রানী, আর কতোদিন
আমি শোনাবো হৃদয়ের কথা, আর আপনি বলবেন, "কী ?"



১২

হে ঈশ্বর, তিনি বোঝেননি, বুঝবেনও না আমার কথা ;
দাও তাঁকে অন্য হৃদয়, যদি আমাকে অন্য ভাষা না দাও ॥

১৩

হৃদয়বেদনা আমার আত্মসমালোচক, কেমন ক'রে জানাই তাঁকে ;
কোন্ আশা তার পূর্ণ হবে মুখে যার কথাই বেধে যায় ॥



১৪

কেমন ক'রে কাটবে বর্ষার অন্ধকার রাত্রিগুলি ;
আমার চোখ যে তারা গুণতেই অভ্যস্ত হ'য়ে আছে, হায় ॥



১৫

জোর খবর — উনি আসবেন ;
আজকেই ঘরে একটা মাদুরও নেই !



১৬

উনি এলেন আমার ঘরে ! কী লীলা ঈশ্বরের ;
আমি একবার তাকাই তাঁর মুখের দিকে, একবার আমার ঘরের দিকে ।

১৭

এক বিদ্যুৎ চমকে গেলো চোখের সামনে, তাতে কী ;
কথা বলতে, আমার ওষ্ঠাধর কথার জন্যেও তৃষ্ণার্ত ছিলো



১৮

প্রত্যেকটি লালহ্‌, ও গোলাপ ফিরে-ফিরে আমার মনকে টানছে ;
অথচ আমি বেরিয়েছি শত ফুলবন দেখার পাথেয় নিয়ে ॥



১৯

ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই -
হে বসন্তের স্রষ্টা, আমার মন পাপী ॥



২০

মনে প'ড়ে যায় কতো অতৃপ্ত বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে রয়েছে ;
হে ঈশ্বর, আমার কাছ থেকে পাপের হিসাব চেয়ো না ॥

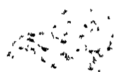
২১

পাপ ক'রে যে-সুখ ভোগ করেছি তার জন্য যদি শাস্তি ধার্য থাকে, তবে হে ঈশ্বর,
আমার না-করা পাপের হাহাকারও কিছু সাধুবাদ পাক তোমার কাছে ॥



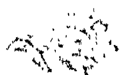
২২

বুলবুলের কাণ্ডকারখানা দেখে ফুল হাসছে
যাকে প্রেম বলে সে তো মস্তিষ্কের বিকার।



২৩

এ যে মানুষের হৃদয়, ইটপাথর নয়, ব্যথায় ভ'রে যাবে না কেন ?
আমি হাজারবার কাঁদবো, কেউ আমাকে কাঁদায় কেন ?



২৪

অনুকম্পা হ'লে ডেকে নিও আমায় যে-কোনো সময়ে ;
আমি তো অতীতকাল নই যে ফিরে আসতেই পারবো না ॥

২৫

আমার এ-গানের তিক্ততা ক্ষমার চোখে দেখো, গালিব,
হৃদয়ের ব্যথা আজ পূর্বের সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ॥



২৬

দুঃখের রাগরাগিনীর মূল্যও বুঝতে শেখো, হৃদয় আমার
অস্তিত্বের এই বিচিত্রবীণাটি একদিন নিঃশব্দ হ'য়ে যাবে ॥



২৭

জীবনের ঘোড়া ছুটে চলেছে, দেখো কোথায় থামে ;
না হাতে আছে লাগাম, না পা আছে রেকাবে ॥



২৮

সৃষ্টির প্রত্যেকটি অঙ্গ ধ্বংসোন্মুখ :
এই চক্রগতি স্বয়ং তো ঝোড়ো হাওয়ার পথে কোনো পথিকের হাতে একটি প্রদীপ ॥

২৯

কে হ'তে চায় পুরুষঘাতী প্রেম-সুরার সাথী—
আমার মৃত্যুর পরে বার-বার এই আহ্বান সাকীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।



৩০

উত্তাল নদীর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নয় তীরের আত্মমর্যাদা,
তুমি যেখানে সাকী, সেখানে নেশায় ডুবে না-যাওয়ার দাবী অর্থহীন



৩১

নিষ্ঠুরতার যে বিশেষ রূপটি তুমি বেছে নিয়েছো সেই রূপে আসাদ মজেছে,
নইলে তোমার প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে মন কাড়বার শক্তি কতোটুকু॥



৩২

এদিকে তাকাও, আয়না হাতে অতো তন্ময় কেন ?
দেখো, কী গভীর তৃষ্ণা চোখে নিয়ে আমি তোমাকে দেখছি

৩৩

সুন্দর মুখ ভালোবাসেন, আসাদ ;
নিজের মুখখানিও তো একবার দেখা চাই ॥



৩৪

কেই-বা জানতো আমার হৃদয়ের ব্যাপার ,
কোন্ কুক্ষণেই যে কবি হ'তে গেলাম, মান-মর্যাদা সবই গেলো ॥



৩৫

এমনও কেউ আছে যে গালিবকে জানে না ?
কবি তো সে ভালোই, তবে বড়ো দুর্নাম তার ॥



৩৬

চারদিকে খবর র'টে গেলো— গালিবকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলা হবে ;
দেখতে আমিও গিয়েছিলাম, কিন্তু তামাশাটা হ'লোই না।

দ্বিতীয় পর্ব

১

আহত চোখের নৈরাশ্যের মহিমা জানে না আকাশ ;
হেমন্তহীন বসন্ত বিফল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নেয় ॥



২

প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্যের সুদূরতা আমার কাছে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে ;
আমার চলাকে পিছনে ফেলে জনশূন্য বনভূমি এগিয়ে চলে আরো জোরে ॥



৩

সুর আছে, ভেসে যাও সুরের স্রোতে ; সুরা আছে, ভুলে যাও সব-কিছু ।
রূপসীর প্রেমে পাগল হ'য়ে যাও, সাধুতা থাক অন্যদের জন্য ॥



৪

ধর্মকর্ম আর সাধুতার পুণ্যফল অপর্যাপ্ত — আমি জানি ;
তবে মনটা সেদিকে যেতে চায় না ॥

৫

নেশা ক'রে সুখ পেতে চায় কোন্ মুখপোড়া,
আমি চাই কেবল রাতদিন নিজেকে একটুখানি ভুলে থাকতে ॥



৬

মদ স্পর্শ করবে না ব'লে শপথ করেছো, গালিব ;
তোমার শপথের উপর কিন্তু একটুও ভরসা করা যায় না।



৭

গালিব, মদ তো ছেড়েছি, তবু এখনও, কচিৎ কখনও,
পান করি মেঘলা দিনে আর জ্যোৎস্না রাতে।



৮

এ কেমন বন্ধুত্ব যে বন্ধু হয়েছেন উপদেষ্টা ;
কেউ যদি উপায় ব'লে দিতো, ব্যথার ব্যথী হ'তো কেউ।

৯

দুঃখ প্রাণঘাতী কিন্তু কেমন ক'রে রক্ষা পাবে আমার হৃদয় ;
প্রেমের জ্বালা না-ও যদি থাকতো, জীবিকার গ্লানি তো থাকতোই ॥



১০

আমার ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে কালের গতি রুদ্ধ ;
যে-দিন মিশকালো তার প্রভাতই বা কী, সন্ধ্যাই বা কী ॥



১১

মৃত্যু ছাড়া জীবনযন্ত্রণার আর কী ওষুধ আছে, আসাদ ;
প্রদীপকে তো সবরকমের জ্বলা জ্বলতেই হবে ভোর হওয়া পর্যন্ত ॥



১২

আসাদের প্রাণের উপর কালের কশাঘাত মৃত্যুই,
আমি তো আরও কঠিনের প্রত্যাশায় রয়েছি ॥

১৩

বছরের পর বছর যদিও আমি জীবিকার উৎপীড়নে নাজেহাল হয়েছি,
তোমার ভাবনা মন থেকে স'রে যায়নি একদিনও ॥



১৪

কানে আর আসে না কোনো বার্তা, চোখ দেখতে পায় না তার রূপ,
একটি তো হৃদয়, তা-ও হতাশায় এমন বিক্ষত !



১৫

কোনো আশাই পূর্ণ হয় না,
কোনো পথই দেখা যায় না কোথাও



১৬

একটু সামলে নিতে দাও, হে নৈরাশ্য ; এ কী প্রলয় কাণ্ড !
বন্ধুর ধ্যানের যে-অঞ্চলপ্রান্তটুকু আমার হাতের মুঠোয় ছিলো তা-ও ফসকে যাচ্ছে ॥

১৭

প্রেমেই জীবনের স্বাদ পেলো আমার মন ;

ব্যথার ওষুধ পেলো, এমন ব্যথা পেলো যার ওষুধ নেই ॥



১৮

দেখো তার বাক্যের চমৎকারিত্ব, সে যা বলে—

আমার মনে হয় এ-ও যেন আমার হৃদয়ের মধ্যেই ছিলো ॥



১৯

শত-শত বাসনা এমন যে প্রত্যেকটির জন্য প্রাণ যায়-যায় ;

অনেক বাসনা আমার পূর্ণ হ'লো, তবুও কম হ'লো ॥



২০

আমার আগ্রহের পাগলামি দেখো, বার-বার আমি

নিজেই যাই ওদিকে, আর নিজেই হয়রান হ'য়ে ভাবি—কেন এলাম ॥

২১

আজ আমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের কথা তাঁকে
বলতে যাচ্ছি তো, তবে দেখুন কী কথা মুখ ফুটে বলি ॥



২২

জীবন তো এমনিতেও কেটে যেতো,
কেন তোমার পথের কথা মনে এলো ?



২৩

আমার বুকে মৃত্যুশেল হানবার পর নিষ্ঠুরতা-বর্জনের শপথ নিলো সে—
হায় রে ঐ ত্বরিত-অনুতাপিনীর অনুতাপ !



২৪

মানলাম যে গালিব কিছুই না, তবু
একেবারে বিনা খরচায় পেয়ে যাও তো মন্দই বা কী ?

২৫

তুমিই জানো, অপরের সাথে তোমার কতোখানি ঘনিষ্ঠতা ;
আমারও খবর যদি নাও মাঝে-মাঝে তো দোষ কী ?



২৬

বাঁচা-মরার ভেদ থাকে না প্রেমে,
তাকে দেখেই বেঁচে আছি, যে-সর্বনাশার জন্য প্রাণ যায় ॥



২৭

একটু কেঁদে নিতে দাও, ভর্ৎসনা ক'রো না বন্ধু ;
কোনো-এক সময়ে তো হৃদয়ের ভার হালকা করবে মানুষ ॥



২৮

হায়, কেন কাঁদতে গেলাম তার কাছে !
আমি কি জানতাম, বন্ধু, এতে বুকের জ্বালা আরো বেড়ে যাবে ॥

২৯

কটুবাক্যে কাজ হাসিল করতে চাও, গালিব ?
নির্দয় বললে সে তোমার উপর সদয় হবে কেন ?



৩০

তোমার প্রেমে পড়াকে হৃদয় ভেবেছিলো কী !
একবার তার কাছে বুঝে নিতে হবে সে-কথাটা ॥



৩১

কিছু তো দাও, হে অবিচারের চূড়ান্ত প্রতীক—
দীর্ঘশ্বাস ফেলবার, মর্মবেদনা জানাবার অনুমতিটুকু অন্তত ॥



৩২

আর কতকাল এ উপযাচক হৃদয় সংকোচে নত হ'য়ে থাকবে ?
হে ঈশ্বর, প্রার্থনার করপুট উঁচু ক'রে তুলে ধরবার সাহস দাও আমাকে ॥

৩৩

না-চাইতেই যদি দেন তিনি তো তার স্বাদই আলাদা ;
সেই ভিখারী শ্রেষ্ঠ, হাত পাতার অভ্যেস হয়নি যার ॥



৩৪

আসাদ, পাইনি ব'লে অনুযোগ অধর্ম, আরও চাই ব'লে হাত পাতা অকৃতজ্ঞতা ;
কিন্তু কী করি, বাসনার ঘন অরণ্যে আমি দিশাহারা ॥



৩৫

মঞ্জুর হবে যদি নিশ্চিত জানো তবে প্রার্থনা ক'রো না,
অর্থাৎ এক প্রার্থনাহীন হৃদয় ছাড়া আর-কিছু চেয়ো না



৩৬

সব মেনে নিতে শিখবো আমিও,
উদাস নতাই যদি তোমার অভ্যাস হয় তো হোক্

৩৭

পেরে উঠতেই হবে, গালিব ;

অবস্থা সঙ্গীন এবং প্রাণ প্রিয় ॥



৩৮

বুকে মিলনের আগ্রহ, প্রিয়ার স্মৃতি পর্যন্ত বাকি নেই ;

এমন আগুন লাগলো এ-ঘরে যে যা ছিলো ছাই হ'য়ে গেলো ॥



৩৯

বাসনার বর্ণে উজ্জ্বল ফুলবাগিচা তো হেমন্তের স্পর্শে শুকিয়ে গেলো ;

তবু বাকি রইলো এমন এক বসন্ত যার রঙ ফিকে,

যার বাতাসে মুমূর্ষু আশার শেষ দীর্ঘশ্বাস ॥



৪০

সাকীর চোখ আর ঘুরে-ঘুরে কারও চোখে বিস্ময় জাগায় না ;

সুরাপাত্র ঘুরে-ঘুরে কারও তৃষ্ণা মেটায় না ;

আমার মজলিসে, গালিব, বাকি আছে শুধু আকাশের অর্থহীন চক্রগতি

৪১

ধর্মবিশ্বাস আমাকে ধ'রে রাখে, অবিশ্বাস আমাকে টানে,
আমার পিছনে রয়েছে কাবা, সামনে প্রতিমার বেদী ॥



৪২

এমনভাবে, গালিব, জীবন কেটেছে,
আমিই কি আর মনে রাখতে পারি যে আমার মনেও ঈশ্বরের স্থান ছিলো



৪৩

সব আছে, না কিছুই নেই, গালিব ?
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী ?   নাকি কোনো ব্যাপারই নেই ?



৪৪

পরম প্রিয়ের শোভা ব্যতীত আর-কিছু নয় এ-মহাবিশ্ব,
আমি হতামই না যদি সুন্দর নিজের রূপ দেখতে না-চাইতো

৪৫

না, সব নয়, অতি অল্পই রূপ নিয়েছে লালহ ও গোলাপের রূপে ;
কী রূপসীই ছিলেন যাঁরা এই মাটির তলায় চাপা প'ড়ে আছেন।



৪৬

গোলাপের কলিগুলি পাপড়ি মেলেছে বিদায় জানাবার জন্য ;
হে বুলবুল, চলো এবার, চ'লে যাচ্ছে বসন্তের দিন ॥



৪৭

আমার অজস্র নিহত যাচনা যৌনের চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে ;
নিঝ্‌ঝুম গোরস্থানে আমি একটি নিভে-যাওয়া দীপ ॥

তৃতীয় পর্ব

১

ফাঁদ পাতা ছিলো বাসার খুব কাছে,
উড়তে-না-উড়তেই ধরা প'ড়ে গেলাম আমি ॥



২

খাঁচার মধ্যে বন্দী আমাকে বাগানের সব খবর শোনাতে দ্বিধা ক'রো না, সখা
কাল যার উপর বাজ পড়লো তা আমারই বাসা হ'তে যাবে কেন ?



৩

না ধনুকে শর রয়েছে সংযোজিত, না ফাঁদ পাতা আছে কোথাও ;
খাঁচার কোণে ব'সে আমি বেশ সুখে আছি ॥



৪

হেমন্ত কী, বসন্তই বা কাকে বলবো—যে-ঋতুই আসুক,
সেই আমি, সেই খাঁচা আর সেই কেটে-ফেলা পালকের জন্য বিলাপ ॥

৫

তার কুণ্ডলিত কেশগুচ্ছ ওৎ পেতে আছে ; হে ঈশ্বর,
আমার স্বাধীন চিত্তের মান রেখো ॥



৬

শতবার প্রেমের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হলাম,
কিন্তু কী করি, হৃদয়ই মুক্তির পরিপন্থী ॥



৭

আবার সাধ চলেছে গ্রাহিকার সন্ধানে, সাজিতে
বুদ্ধি হৃদয় ও প্রাণের উপঢৌকন সাজিয়ে নিয়ে ॥



৮

আবার হৃদয় আমার অস্থির হ'য়ে উঠেছে,
খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে যার আঘাতে সে আবারও বিক্ষত হবে ॥

৯

রাগিনীর আলাপ নই, সেতারের তার নই ;

আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ ॥



১০

একদিকে আমি — শত সহস্র আর্তনাদ ,

অন্যদিকে তুমি — এক পরমাশ্চর্য না-শোনা ॥



১১

কিছুমাত্র যোগাযোগ থাকলে নিজেকে বোঝাতাম হৃদয়ের যোগ আছে তলায়

যেখানে কিছুই নেই, প্রতারণাও অসম্ভব সেখানে ॥



১২

ভালোবাসা চায় ধৈর্য, বাসনা অধীর ।

আঘাতে-আঘাতে হৃদয় আরও কঠিন হবে ;

    ততোদিন কী দিয়ে ভোলাবো তাকে ?

১৩

নৈরাশ্যের ভীড় আর যেন না-বাড়ে, ছাই হ'য়ে যাবে
সেই যে এক স্বাচ্ছতা এখনো রয়েছে আমার নিষ্ফল প্রয়াসে।



১৪

হে অপরিণামদর্শী হৃদয় আমার, অভিলাষ সম্বৃত করো ;
বন্ধুর রূপের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করবার শক্তি তুমি পাবে কোথায়



১৫

সুরাপাত্রের গায়ে নানা বর্ণের চিত্র ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাও তুমি ,
বিস্ময়ে উদ্‌ভ্রান্ত চোখের আয়নায় আমি তা ধ'রে রাখি ॥



১৬

শত শোভা রয়েছে চোখের পাতা তোলার অপেক্ষায়,
চোখের দানে ধন্য হবার সামর্থ্য কি আছে তোমার ?

১৭

অর্থ বুঝবার যোগ্যতা যদি না-ও হয় কোনোদিন,
তবু রূপের বর্ণবৈচিত্র্য দেখার শক্তিটুকু বেঁচে থাক ॥



১৮

অকারণে আত্মহারা হইনি গালিব ;
কিছু তো আছে গোপন, নইলে এতো ঢাকাঢাকি কিসের ॥



১৯

তোমারই রসবোধে ধরা দেয়নি অনন্ত রহস্যের বিচিত্র রাগ ;
নইলে রহস্যের আবরণ তো সুরেরই পর্দা ॥



২০

প্রেমের কৃচ্ছ্রসাধকদের খবর আর কী শুনবে,
তারা কখন আপাদমস্তক দুঃখের মূর্তি হ'য়ে গেলো

২১

ঘরে ছিলো কী যা তোমার দেওয়া দুঃখ ধ্বংস করতো ?
ছিলো কিছু গ'ড়ে তুলবার বিষণ্ণ বাসনা, এখনও আছে তা ॥



২২

মন্দির নয়, কাবা নয়, কারো দরজা নয়, আস্তানা নয় ;
ব'সে আছি পথের ধারে, সেখান থেকেও আমায় উঠিয়ে দেয় কেন ?



২৩

ঈর্ষ্যা বলে, অন্যের সঙ্গে তার বন্ধুতা, হায় ;
বুদ্ধি বলে, সে-নির্দয় কারো সুহৃদ হ'তে পারে না ॥



২৪

খেলা ভেবেছে, কোন্‌দিন খেলা ভেঙে দেবে, ভুলে যাবে ;
হে ঈশ্বর, এমনই যেন হয় যে আমাকে না-জ্বালিয়ে সে থাকতে না-পারে ॥

২৫

গালিব, তোমার দুঃখের সব কথা শুনিয়ে তো দেবো ;
তবে শুনে তিনি ডেকে পাঠাবেন তোমাকে—এমন ঠিকা নিতে পারি না ।



২৬

আসবে ব'লে কথা দিয়েছো, কথা রাখো ; এ কেমন রীতি তোমার,
আমাকে আমারই দরজায় দারোয়ানির কাজ দিয়েছো কেন ?



২৭

প্রেম ছাড়া জীবন কাটে না, অথচ
প্রেমের যন্ত্রণায় যে-স্বাদ আছে, তা গ্রহণ করার শক্তিও আমার নেই ।



২৮

এখানে যাবজ্জীবন বন্দী হ'য়ে আছে লক্ষ কামনা-বাসনা, আসাদ,
আমার রক্তাক্ত বক্ষকে কারাগার ব'লেই জানি ।

২৯

আমার অফুরন্ত সাধ অনুযোগ করছে — হৃদয়ে বড়ো স্থানাভাব ;
সমুদ্রের উত্তালতা যেন মোতির মধ্যে আবদ্ধ।



৩০

বাসনার নিত্য নব রঙের দর্শক আমি ,
আমার বাসনা কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা, অবান্তর সে-কথা ॥



৩১

সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রো না, বন্ধু ;
আর যদি কিছু না-থাকে তো শত্রুতাই থাক ॥



৩২

হে নিষ্ঠুর, তুমি কারো বন্ধু হ'লে না ;
অন্যদের উপর সেইসব জুলুম চলছে যা আমার উপরে হয়নি ॥

৫৩

এমন নিষ্ঠুরতা থেকেও বঞ্চিত আমি – হায় ঈশ্বর,
একনিষ্ঠ প্রেমিকের সঙ্গে এতোখানি শত্রুতা !



৫৪

কেমন ক'রে তোমাকে বলি তুমিই করেছো আমার সর্বনাশ,
এতে ভাগ্যের দক্ষ হাতের খেলাও ছিলো কিছু ।



৫৫

তোমার প্রেমনিষ্ঠায় আমার বুকের জ্বালা কেমন ক'রে জুড়াবে এই সংসারে ?
তোমার নির্যাতন ছাড়া আরও অনেক নির্যাতন আমাকে সইতে হয়েছে.।



৫৬

হৃদয়ের গতিবিধি তো জানি না, কিন্তু এইটুকু –
আমি বার-বার খুঁজলাম, তুমি বার-বার কুড়িয়ে পেলে ।

৩৭

জ্বলযন্ত্রণার পাঠশালায় শিক্ষানবীশী করছি এখনো,
দুটিমাত্র পাঠ রপ্ত হয়েছে — 'ছিলো' আর 'গেলো' ॥



৩৮

আমি ব্যাকুল আর তিনি বিরক্ত —
হায় ঈশ্বর, এ কী ব্যাপার ?



৩৯

আমার বেদনায় তোমার আকুলতা, হায় রে হায় !
কোথায় গেলো তোমার অভ্যস্ত অবহেলা, হায় হায় ।



৪০

মন তার পেয়েই যেতে, গালিব ;
আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে পারতে

৪১

বন্ধুর সাথে মিলন ভাগ্যে ছিলো না ;
যদি আরও বাঁচতাম, এই প্রতীক্ষাই চলতো ।



৪২

হে ঈশ্বর, কাল আমাকে মুছে ফেলছে কেন ?
পৃথিবীর পৃষ্ঠার উপর আমি বাড়তি হরফ তো নই ॥



৪৩

চ'লে যাচ্ছি জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ;
আমি এক নির্বাপিত প্রদীপ, মহফিলে রাখার যোগ্য নই আর ।



৪৪

এই কফনহীন মৃতদেহ ভগ্নহৃদয় আসাদেরই ,
ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন, বড়ো স্বাধীনচিত্ত পুরুষ ছিলো ।

৪৫

কতোকাল হ'লো গালিব মারা গেছে, তবু মনে পড়ে
কথায়-কথায় তার বলা:—"এমন যদি হ'তো তাহ'লে কী হ'তো?"

मूल

প্রথম পর্ব

১

হম-নে বহ্‌শৎকদহ্‌-এ বজ্‌ম্‌-এ জহাঁ-মেঁ জুঁ শমা
শোলহ্‌-এ ইশ্‌ক্‌-কো অপনা সর ও সামাঁ সমঝা ॥



২

রওনক্‌-এ হস্তী হৈ ইশ্‌ক্‌-এ খানহ্‌ ও বীরানহ্‌ সাজ্‌-সে
আঞ্জুমন বেশমা হৈ গর বর্ক্‌ খিরমন-মেঁ নহীঁ ॥



৩

য়েহ্‌ ফিত্‌নহ্‌ আদমী-কা খানহ্‌-বীরানী-কো কেয়া কম হৈ ?
হুয়ে তুম দোস্ত্‌ জিস-কে দুশ্‌মন উস-কা আ:সমাঁ কিয়ুঁ হো ?



৪

খুশী কেয়া খেত পর মেরে অগর সও বার অবর আয়ে ;
সমঝতা হুঁ কেহ্‌ ঢুঁঢে হৈ অভী বর্ক্‌ খিরমন-কো ॥

৫

হম কহাঁ-কে দানা থে, কিস হুনর-মেঁ য়কতা থে,
বেসবব হুয়া, গালিব, দুশমন আসমাঁ অপ্‌না ।



৬

ফ়লক্‌-কো দেখ-কে করতা হুঁ য়াদ উস-কো, অসদ ;
জফ়া-মেঁ উস-কে হৈ অন্দাজ় কার্‌ফ়র্‌মা-কা ।



৭

বেদাদ-এ ইশ্‌ক্‌-সে নহীঁ ডরতা মগর, অসদ :
জিস দিল-পে নাজ় থা মুঝে বোহ্‌ দিল নহীঁ রহা ।



৮

বোহ্‌ ফ়িরাক্‌ অওর বোহ্‌ বিসাল কহাঁ,
বোহ্‌ শব ও রোজ় ও মাহ্‌ ও সাল কহাঁ ।

৯

থী বোহ্ এক শখ্স্-কে তসব্বুর-সে,
অব বোহ্ রানাই-এ খ্য়াল কহাঁ ?



১০

ইশ্ক্ পর জোর নহীঁ, হৈ য়েহ্ বোহ্ আতশ, গালিব,
জো লগায়ে নহ্ লগে, অওর বুঝায়ে নহ্ বুঝে ।



১১

বেনিয়াজী হদ্-সে গুজ্রী, বন্দহ্-পরবর, কব তলক
হম কহেঁগে হাল-এ দিল অওর আপ ফর্মায়েঁগে – "কেয়া" ?



১২

য়া রব্, বোহ্ নহ্ সমঝে হৈঁ নহ্ সমঝেঁগে মেরী বাত ;
দে অওর দিল উন-কো জো নহ্ দে মুঝ-কো জবাঁ অওর ।

১৩

নুকতহ্‌চীঁ হৈ গম্‌-এ দিল, উস-কো সুনায়ে নহ্‌ বনে ;
কেয়া বনে বাত জহাঁ বাত বনায়ে নহ্‌ বনে ॥



১৪

কিস তরহ্‌ কাটে কোঈ শব্‌হা-এ তার-এ বর্ষগাল
হৈ নজ়র খু্‌করদহ্‌-এ অখ্‌তর-শুমারী, হায় হায় ॥



১৫

হৈ খবর গর্ম্‌ উন-কে আনে-কী,
আজ-হী ঘর-মেঁ বোরিয়া নহ্‌ হুয়া ॥



১৬

বোহ্‌ আয়েঁ ঘর-মেঁ হমারে, খুদা-কী কুদরৎ হৈ ;
কভী হম উন-কো কভী অপনে ঘর-কো দেখতে হৈঁ ॥

১৭

বিজ্‌লী এক কূ দ গঈ আঁখো-কে আগে তো কেয়া ;
বাত করতে কেহ্‌ মৈঁ লবতশ্‌নহ্‌-এ তক্‌রীর ভী থা ॥



১৮

দওড়ে হৈ ফির হর্‌ এক গুল ও লালহ্‌ পর্‌ খ়য়াল,
সদ গুলিস্তাঁ নিগাহ্‌-কা সামাঁ কিয়ে হুয়ে ॥



১৯

তমাশা-এ গুল্‌শন, তমন্না-এ চীদন্‌ —
বহার-আফ্‌রীনা, গুনহ্‌গার হৈঁ হম ॥



২০

আতা হৈ দাগ়-এ হস্‌রৎ-এ দিল-কা শুমার য়াদ,
মুঝ-সে মেরে গুনাহ্‌-কা হিসাব অয় খু্দা নহ্‌ মাঁগ্‌ ॥

২১

না-কর্দহ্ গুনাহোঁ-কী ভী হস্রৎ-কী মিলে দাদ,
যা রব্, অগর ইন কর্দহ্ গুনাহোঁ-কী সজা হৈ ॥



২২

বুলবুল-কে কারোবার-পে হৈঁ খন্দহা-এ গুল—
কহ্তে হৈঁ জিস-কো ইশ্ক্, খলল্ হৈ দিমাগ্-কা ॥



২৩

দিল হী তো হৈ নহ্ সঙ্গ্ ও খিশ্ৎ, দর্দ্-সে ভর নহ্ আয়ে কিউ ?
রোয়েঁগে হম হজার বার, কোঈ হমেঁ রুলায়ে কিউ ?



২৪

মেহেরবাঁ হোকে বুলালো মুঝে চাহে জিস বক্ৎ।
মৈঁ গয়া বক্ৎ নহীঁ হূঁ কেহ্ ফির আ-ভী নহ্ সকূঁ ॥

২৫

রখিয়ো, গ়ালিব, মুঝে ইস তল্খ্-নবাঈ-মেঁ মাফ়্ ;
আজ কুছ দর্দ্ মেরে দিল্-মেঁ সিবা হোতা হৈ ॥



২৬

নগ়্মহা-এ গ়ম্-কো ভী অয় দিল গ়নীমৎ জানিয়ে ,
বেসদা হো জায়েগা য়েহ্ সাজ়-এ হস্তী এক দিন ॥



২৭

রও-মেঁ হৈ রখ্শ্-এ উমর, কহাঁ দেখিয়ে থমে ;
নে হাথ বাগ পর হৈ, নহ্ পা হৈ রকাব-মেঁ ॥



২৮

হৈঁ জ়বাল-আমাদহ্ অজ়্জ়া আফরীনশ্-কে তমাম ;
মহর-এ গর্দূঁ হৈ চিরাগ়-এ রাহ্গুজ়র-এ বাদিয়াঁ ॥

২৯

কৌন হোতা হৈ হরীফ-এ ময়-এ মর্দ-অফ্গন-এ ইশ্ক্—
হৈ মুকররর্ লব-এ সাকী-পে সদা মেরে বাদ ॥



৩০

হরীফ-এ জোশিশ্-এ দরিয়া নহীঁ খুদ্দারী-এ সাহিল,
জহাঁ সাকী হো তূ, বাতিল হৈ দাবা হোশিয়ারী-কা ॥



৩১

অসদ ফরেফ্তহ্-এ ইন্তখাব-এ তর্জ-এ জফা,
বগরনহ্ দিলবরী-এ বাদহ্-এ বফা মালুম ॥



৩২

তমাশা কর অয় মহ্ব্-এ আঈনহ্দারী,
তুঝে কিস তমন্না-সে হম দেখতে হৈঁ ॥

৩৩

চাহতে হৈঁ খ়ুবরুয়োঁ-কো অসদ ;

আপ-কী সূরৎ তো দেখা চাহীয়ে ॥



৩৪

খুল্‌তা কিসী-পে কিঁউ মেরে দিল-কা মুআমিলহ্‌,

শেরোঁ-কে ইন্তখাব-নে রুস্‌বা কিয়া মুঝে ॥



৩৫

হোগা কোঈ ঐসা-ভী কেহ্‌ গ়ালিব-কো নহ্‌ জানে ?

শায়র তো বোহ্‌ অচ্ছা হৈ পে বদনাম বহুৎ হৈ ॥



৩৬

থী খবর গর্ম্‌ কেহ্‌ গ়ালিব-কে উড়েঁগে পুর্জে ;

দেখনে ম-হভী গয়ে থে পেহ্‌ তমাশা নহ্‌ হুয়া ॥

দ্বিতীয় পর্ব

১

উক্কত-এ ন-উমীদী-এ চশ্ম্-এ তখ্ম্ চর্খ্ কেয়া জানে,
বহার-এ বে-খিজাঁ অক্ত্ আহ্-এ বেতাসীর হৈ পয়দা ॥



২

হর কদম্ দূরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝ-সে,
মেরী রফ্তার-সে ভাগে হৈ বয়াবাঁ মুঝ-সে ॥



৩

নগ্মহ্ হৈ, মহ্ব্-এ সাজ্ রহ্, নশহ্ হৈ, বেনিয়াজ রহ্,
রিন্দ্-এ তমাম্-এ না ্ রহ্; খলক্-কো পারসা সমঝ ॥



৪

জান্তা হুঁ সবাব-এ তা'অৎ ও জুহদ্,
পর তবী'অৎ উধর নহীঁ আতী ॥

৫

মৈ সে গর্জ্ নিশাৎ হৈ কিস্ রূসিয়াহ্-কো,
একগুনহ্ বেখ়্দী মুঝে দিনরাত চাহিয়ে ॥



৬

তুনে কসম ময়কশী-কী খাঈ হৈ, গালিব ,
তেরী কসম-কা কুছ এতিবার নহীঁ হৈ ॥



৭

গালিব, ছুটী শরাব, পর অব্-ভী কভী কভী
পীতা হুঁ রোজ-এ অবর্ ও শব-এ মাহ্তাব-মেঁ ॥



৮

য়েহ্ কহাঁ-কী দোস্তী হৈ কেহ্ বনে হৈঁ দোস্ত্ নাসেহ্ ;
কোঈ চারহ্সাজ্ হোতা, কোঈ গমগুসার হোতা ॥

৯

গম অগরচেহ্ জাঁ-গুসল্ হৈ, পে কহাঁ বচে কেহ্ দিল হৈ ;
গম-এ ইশ্ক্ গর নহ্ হোতা, গম-এ রোজগার হোতা ॥



১০

নওমীদী-এ মা গার্দিশ-এ অয়্যাম নহ্ দারদ্ ;
রোজে কেহ্ সিয়হ্ শুদ সহর ও শাম নহ্ দারদ্ ॥



১১

গম-এ হস্তী-কা, অসদ, কিস-সে হো জুজ্ মর্গ্ ইলাজ,
শমা হর রঙ্গ-মে জল্তী হৈ সহর হোনে তক ॥



১২

জমানহ্ সখ্ৎ কম-আজার হৈ বজান-এ অসদ,
বগরনহ্ হম তো তবকো জিয়াদহ্ রখতে হৈঁ ॥

১৩

গো মৈঁ রহা রহীন্-এ সিতমহা-এ রোজ্গার ;
লেকিন তেরে খয়াল-সে গাফিল নহীঁ রহা ॥



১৪

গোশ মহ্জুর-এ পয়াম্ ও চশ্ম্ মহ্রূম-এ জমাল ;
এক দিল তিস পর য়েহ্ না-উম্মীদবারী, হায় হায় ॥



১৫

কোঈ উম্মীদ বর নহীঁ আতী,
কোঈ সূরৎ নজর নহীঁ আতী ॥



১৬

সঁভল্নে দে মুঝে, অয় না-উম্মীদী, কেয়া কয়ামৎ হৈ,
কেহ্ দামান-এ খয়াল-এ য়ার ছুটা জায়ে হৈ মুঝ-সে ॥

১৭

ইশ্‌ক্‌-সে তবীয়ৎ-নে জীস্ত্‌-কা মজা পায়া,
দর্দ-কী দবা পাঈ, দর্দ-এ বেদবা পায়া ॥



১৮

দেখনা তক্‌রীর-কী লজ্‌জৎ কেহ্‌ জো উস-নে কহা,
মৈঁ-নে য়েহ্‌ জানা কেহ্‌ গোয়া য়েহ্‌-ভী মেরে দিল-মেঁ হৈ



১৯

হজারোঁ খ্‌বাহিশেঁ ঐসী কেহ্‌ হর খ্‌ বাহিশ-পে দম নিক্‌লে,
বহুৎ নিক্‌লে মেরে অর্‌মান, ফির-ভী কম নিক্‌লে ॥



২০

বাজে দিবানগী-এ শওক্‌ কেহ্‌ হরদম মুঝ-কো
আপ জানা উধর অওর আপ-হী হৈরাঁ হোনা ॥

২১

আজ হম অপনী পরেশানী-এ খ়াতির উন-সে
কহ্‌নে জাতে তো হৈঁ পর দেখিয়ে ক্যেয়া কহ্‌তে হৈঁ



২২

জিন্দগী য়ুঁ-ভী গুজর হী জাতী,
কিঁউ তেরা রাহ্‌গুজর য়াদ আয়া



২৩

কী মেরে কত্‌ল্‌-কে বাদ উস-নে জফ়া-সে তওবহ্‌
হায় উস জ়ুদ্‌পশীমাঁ-কা পশীমাঁ হোনা !



২৪

মৈঁ-নে মানা কেহ্‌ কুছ নহীঁ গালিব ;
মুফ়্‌ৎ হাথ আয়ে তো বুরা ক্যেয়া হৈ ?

২৫

তুম জানো তুম-কো গৈর্-সে জো রস্‌ম্ ও রাহ্‌ হো ;
মুঝ-কো ভী পূছতে রহো তো কেয়া গুনাহ্‌ হো ॥



২৬

মুহব্‌বত-মেঁ নহীঁ হৈ ফর্ক্‌ জীনে অওর মরনে-কা ।
উসী-কো দেখকর জীতে হৈঁ জিস কাফির-পে দম নিকলে ॥



২৭

য়োনে-সে অয় নদীম মলামৎ নহ্‌ কর মুঝে,
আখির কভী তো উক্‌দাহ্‌-এ দিল বা করে কোঈ ॥



২৮

নহ্‌ করতা কাশ নালহ্‌ মুঝ-কো কেয়া মালুম থা হম্‌দম্‌,
কেহ্‌ হোগা বা'অস-এ অফ্‌জাইশ-এ দর্দ্‌-এ দরূ বোহ্‌-ভী ॥

২৯

নিকালা চাহ্‌তা হৈ কাম কেয়া তানোঁ সে তূ, গালিব ?
তেরে বেমেহের কহ্‌নে-সে বোহ্‌ তুঝ-পর মেহেরবাঁ কিঁউ হো ?



৩০

চাহ্‌নে-কো তেরে কেয়া সমঝা থা দিল ;
বারে অব উস-সে-ভী সমঝা চাহিয়ে ॥



৩১

কুছ তো দে অয় ফলক্‌-এ নাইন্‌সাফ্‌,—
আহ্‌ ও ফরিয়াদ-কী রুখ্‌সৎ-হী সহী ॥



৩২

তা চন্দ্‌ পস্ত্‌ ফিৎরতী-এ তবা-এ আরজু ;
য়া রব, মিলে বুলন্দী-এ দস্ত্‌-এ দোয়া মুঝে ॥

৮৩

মৈতলব পে তো মজা উস-মেঁ সিবা মিলতা হৈ ;
বো গ্‌দা জিস-কো নহ্‌ তো খু-এ সবাল, আচ্ছা হৈ ॥



৮৪

অসদ, শিক্‌বহ্‌ কুফ্র্‌ ও দোয়া না-সিপাসী ,
হজুম-এ তমন্না-সে নাচার হৈঁ হম ।



৮৫

গর তুঝ-কো হৈ য়কীন-এ ইজাবৎ, দোয়া নহ্‌ মাঙ্‌,
য়ানি, বেগৈর এক দিল-এ বেমুদ্দোয়া, নহ্‌ মাঙ্‌ ॥



৮৬

হম-ভী তসলীম-কী খু ডালেঙ্গে,
বেনিয়াজী তেরী আদৎ-হী সহী ॥

৩৭

তাব লায়ে-হী বনেগী, গ়ালিব,
বাকেয়া সখ্‌ৎ হৈ অওর জান অজীজ ॥



৩৮

দিল-মেঁ শওক্‌-এ বস্‌ল্‌ ও য়াদ-এ য়ার তক বাকী নহীঁ ;
আগ ইস ঘর-মেঁ লগী ঐসী কেহ্‌ জো থা সো জল গয়া ॥



৩৯

চমনজার-এ তমন্না হো গয়া সর্ক্‌-এ বিজা লেকিন,
বহার-এ নীম্‌রঙ্‌ আহ্‌-এ হস্‌রৎনাক্‌ বাকী হৈ ॥



৪০

নহ্‌ হৈরৎ চশ্‌ম্‌-এ সাকী-কী, নহ্‌ সোহ্‌বৎ দওর-এ সাগ়র-কী ;
মেরী মহ্‌ফিল-মেঁ, গ়ালিব, গর্‌দিশ-এ অফ্‌লাক বাকী হৈ ॥

৪১

ঈমাঁ মুঝে রোকে হৈ জো খীঁচে হৈ মুঝে কুফ্‌র্।
কাবহ্‌ মেরে পীছে হৈ, কলীসা মেরে আগে ॥



৪২

জিন্দগী অপ্‌নী জব্‌ ইস শকল্‌-সে গুজ্‌রী, গালিব,
হম-ভী কেয়া যাদ করেঙ্গে কেহ্‌ খুদা রখতে থে ॥



৪৩

হস্তী হৈ নহ্‌ কুছ অদম্‌ হৈ, গালিব!
আখির তো কেয়া হৈ, অয় নহীঁ হৈ?



৪৪

দহর্‌ জুজ জল্‌বহ্‌-এ য়কতাই-এ মাশূক্‌ নহীঁ ;
হম কহাঁ হোতে অগর হুস্ন্‌ নহ্‌ হোতা খুদবীঁ ॥

৬৫

সব কহাঁ কুছ লালহ্‌-ও গুল-মেঁ নুমায়াঁ হো গয়ীঁ,
খাক-মেঁ কেয়া সূরতেঁ হোঁগী কেহ্‌ পিন্‌হাঁ হো গয়ীঁ ।



৬৬

আগোশ-এ গুল কুশাদহ্‌ বরায়ে বিদা হৈ ;
অয় অন্দলীব চল্‌ কেহ্‌ চলে দিন বহার-কে ।



৬৭

খামোশী-মেঁ নিহাঁ খঁূ-কুশ্‌তহ্‌ লাখোঁ আরজূঁয়েঁ হৈঁ ;
চিরাগ-এ মুর্দহ্‌ হুঁ মৈঁ বেজবান গোর-এ গরীবাঁ-কা ।

তৃতীয় পর্ব

১

পিন্‌হাঁ থা দাম সখ্‌ৎ করীব আশিয়াঁ-কে,
উড়নে নহ্‌ পায়ে থে কেহ্‌ গিরফ্‌তার হম হয়ে ।



২

কফস্‌-মেঁ মুঝে রুদাদ-এ চমন কহ্‌তে নহ্‌ ডর, হম্‌দম ;
গিরী থী জিস-পে কল বিজলী বোহ্‌ মেরা আশিয়াঁ কিঁউ হো ।



৩

নৈ তীর কমাঁ-মেঁ হৈ, নহ্‌ সৈয়াদ কমী-মে হৈ,
গোশহ্‌-মেঁ কফস্‌-কে মুঝে আরাম বহুৎ হৈ ।



৪

খিজাঁ কেয়া, ফস্‌ল্‌-এ গুল কহ্‌তে হৈঁ কিস-কো, কোঈ মওসম হো –
বোহী হম্‌ হৈঁ, কফস্‌ হৈ, অওর মাতম বাল ও পর-কা হৈ ।

৫

বোহ্ হল্কহা-এ জুল্ফ্ কমী-মেঁ হৈঁ, অয় খুদা,
রখ লীজীয়ো মেরে দাবা-এ বারিস্তগী-কী শর্ম্ ॥



৬

সও বার বন্দ্-এ ইশ্ক্-সে আজাদ হম হুয়ে,
পর কেয়া করেঁ কেহ্ দিল-হী উদূ হৈ ফিরাগ্-কা ॥



৭

ফির শওক্ কর-রহা হৈ খরীদার-কী তলব,
অর্জ্-এ মতা-এ অক্ল্ ও দিল ও জাঁ কিয়ে হুয়ে ॥



৮

ফির কুছ এক দিল-কো বেকরারী হৈ।
সীনহ্ জূয়া-এ জখ্মকারী হৈ ॥

৯

নহ্‌ গুল-এ নগ্‌মহ্‌ হুঁ, নহ্‌ পর্দহ্‌-এ সাজ্‌,
মৈঁ হুঁ অপনী শিকস্ত্‌-কী আবাজ্‌ ॥



১০

মৈঁ অওর অন্দহ্‌জ্বার নবা-এ জিগর- .রাশ্‌,
তূ অওর এক বোহ্‌ না-শুনীদন কেহ্‌ কেয়া কহূঁ ॥



১১

লাগ হো তো উস-কো হম সমঝেঁ লগাও,
জব নহ্‌ হো কুছ-ভী তো ধোকা খাঁয় কেয়া ॥



১২

আশিকী সব্‌র্‌-তলব্‌ অওর তমন্না বেতাব ;
দিল-কা কেয়া রঙ্গ করূঁ খূ্‌ন-এ জিগর হোনে তক ॥

১৩

বস্ হজুম-এ না-উম্মীদী, খাক-মেঁ মিল জায়েগী
য়েহ্ জো এক লজ্জৎ হমারী সয়ী-এ বেহাসিল-মেঁ হৈ ॥



১৪

অয় দিল-এ না-আকি়বৎ-অন্দেশ, জব্ৎ-এ শওক্ কর ;
কওন লা সক্তা হৈ তাব-এ জল্বহ্-এ দীদার-এ দোস্ত্ ॥



১৫

গর্দিশ-এ সাগর-এ জল্বহ-এ রঙ্গীন তুঝ-সে,
আঈনহ্দারী-এ এক দীদহ্-এ হৈরাঁ মুঝ-সে ॥



১৬

সদ্ জল্বহ্ রু-বরু হৈ জো মিঝ্গাঁ উঠাইয়ে,
তাকৎ কহাঁ কেহ্ দীদ-কা ইহ্সাঁ উঠাইয়ে ॥

১৭

নহীঁ গর সর ও বর্গ্-এ অদ্‌রাক-এ মানে।
তমাশা-এ নৈরঙ্-এ সূরৎ সলামৎ ॥



১৮

বেখ্‌দী বেসবব নহী, গালিব,
কুছ তো হৈ জিস-কী পর্দহ্‌দারী হৈ ॥



১৯

মহ্‌রম নহীঁ হৈ তু-হী নবাহা-এ রাজ্-কা ;
য়াঁ বরনহ্ জো হিজাব হৈ, পর্দহ্ হৈ সাজ্-কা ॥



২০

সখ্‌তী-কশান-এ ইশ্‌ক্-কী পুছে হৈ কেয়া খবর ;
বোহ্ লোগ রফ্‌তহ্ রফ্‌তহ্ সরাপা অলম্ হুয়ে ॥

২১

ঘর-মেঁ থা ক্যা কেহ্ তেরা গ়ম উসে গ়ারৎ করতা ;
বোহ্ জো রখতে থে হম্ এক হসরৎ-এ তামীর, সো হৈ ॥



২২

দৈর্ নহীঁ, হরম্ নহীঁ, দর নহীঁ, আস্তাঁ নহী ;
বৈঠে হৈঁ রাহ্‌গুজ়র-পে হম, গ়ৈর হমেঁ উঠায়ে কিয়ূঁ ?



২৩

রশ্‌ক্ কহ্‌তা হৈ—উস-কা গ়ৈর-সে ইখ্‌লাস, হৈফ্ ;
অক়ল্ কহ্‌তী হৈ কেহ্ বোহ্ বেমেহের কিস-কা আশ্‌না ॥



২৪

খেল সমঝা হৈ, কহীঁ ছোড় নহ্-দে, ভূল নহ্-জায়,
কাশ, য়ূহী হো কেহ্ বিন মেরে সতায়ে নহ্-বনে ॥

২৫

গালিব, তেরা অহ্‌বাল সুনা দেংগে হম উন-কো,
বোহ্ সুনকে বুলালে য়েহ্ ইজারা নহীঁ করতে ।



২৬

বাদহ্ আনে-কা বফ়া কীজীয়ে ; য়েহ্ ক্যেয়া অন্দাজ হৈ,
তুম-নে কিউঁ সঁওপী হৈ মেরে ঘর-কী দরবানী মুঝে ।



২৭

বে-ইশ্‌ক্ উমর কট নহীঁ সকতী হৈ, অওর য়া
তাক়ৎ বক়দর-এ লজ্জৎ-এ আজার-ভী নহীঁ ।



২৮

কায়েমুল-হবস ইস-মেঁ হৈঁ লাখোঁ তমন্নায়েঁ, অসদ ;
জানতে হৈঁ সীনহ্-এ পুরখূঁ-কো জিন্দাখানহ্ হম ।

২৯

গিলহ্‌ হৈ শওক্‌-কো দিল-মেঁ ভী তঙ্গী-এ জা-কা।
গৌহর-মেঁ মহ্‌ব হুয়া ইজ্‌তরাব দরিয়া-কা॥



৩০

হুঁ মৈঁ-ভী তমাশাই-এ নৈরঙ্গ্‌-এ তমন্না,
মৎলব নহীঁ কুছ ইস-সে কেহ্‌ মৎলব-হী বর আয়ে॥



৩১

ক্‌তা কীজীয়ে নহ্‌ ত'অল্লুক্‌ হম-সে,
কুছ নহীঁ হৈ তো অদাবৎ-হী সহী॥



৩২

তু দোস্ত্‌ কিসী-কা-ভী সিতমগর নহ্‌-হুয়া থা।
অওরো -পে হৈ বোহ্‌ যুল্ম্‌ জো মুঝ-পর নহ্‌ হুয়া থা॥

৩৩

অব জফা-সে ভী হৈঁ মহরূম, অল্লাহ্, অল্লাহ্;
ইস্ কদর্ দুশ্মন্-এ অর্বাব-এ বফা হো জানা ॥



৩৪

তুম-সে বেজা হৈ মুঝে অপনী তবাহী-কা গিলা,
ইস-মেঁ কুছ শাইবা-এ খ়ূবী-এ তক্দীর-ভী থা ॥



৩৫

তেরী বফ়া-সে ক্যা হো তলাফ়ী, কেহ্ দহর্-মে
তেরে সিবা-ভী হম-পে বহুৎ-সে সিতম হুয়ে ॥



৩৬

হাল-এ দিল নহীঁ মালুম লেকিন ইস কদ্র্, যানী,
হম-নে বারহা ঢুঁঢা, তুম-নে বারহা পায়া ॥

৩৭

লেতা হুঁ মক্তব্-এ গ্‌ম্-এ দিল-মেঁ সবক্ হনূজ্,
লেকিন য়েহী কেহ্ 'রফ্‌ৎ' গয়া, অওর 'ব্‌দ' থা ॥



৩৮

হম্ হৈঁ মুশ্‌তাক্ অওর বোহ্ বেজ়ার,
য়া ইলাহী য়েহ্ মাজ্‌রা কেয়া হৈ ?



৩৯

দর্দ্-সে মেরে হৈ তুঝ-কো বেক়রারী, হায় হায় !
কেয়া হুঈ জ়ালিম তেরী গফ্‌লৎ-শোয়ারী, হায় হায় !



৪০

আ-হী জাতা বোহ্ রাহ্-পর, গ়ালিব,
কোঈ দিন অওর-ভী জীয়ে হোতে ॥

৪১
য়েহ্ নহ্ থী হমারী কিস্মৎ কেহ্ বিসাল-এ য়ার হোতা,
অগর অওর জীতে রহ তে য়হী ইন্তজার হোতা।



৪২
য়া রব, জমানা মুঝ-কো মিটাতা হৈ কিসলিয়ে,
লওহ্-এ জহাঁ-পে হর্ফ্-এ মুকর্‌রর নহীঁ হূঁ মৈঁ।



৪৩
জাতা হূঁ দাগ্-এ হস্রৎ-এ হস্তী লিয়ে হুয়ে,
হূঁ শমা-এ কুশ্‌তহ্ দরখ্‌ুর-এ মহ্‌ফিল নহীঁ রহা।



৪৪
য়েহ্ লাশ-এ বেকফন অসদ খস্তহ্‌জাঁ-কী হৈ ;
হক্ মগ্‌ফিরৎ করে, অজব আজাদ মর্দ্ থা।

১৫

হয়ী মুদ্দৎ কেহ্ গ়ালিব মর গয়া, পর য়াদ আতা হৈ
বোহ্ হরেক বাত-পর কহ্না কহ্ 'য়ুঁ হোতা তো কেয়া হোতা।'

উত্তরভাষ

গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা

অন্যান্য ভাষার গীতিকাব্যে যেমন, উর্দু গজলেও তেমনি রোমান্টিক প্রেমের আসন খুবই বিস্তৃত। বস্তুতপক্ষে একমাত্র বিষয় না-হ'লেও প্রেমই গজলের প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি— বিশেষত যে-সৌন্দর্যকে একাধারে ভয়ংকর এবং মহিমান্বিত (ইংরেজীতে 'সাব্লাইম') বলা যায় তার প্রতি— ভাবাবেগ ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ ও শেলীর সমসাময়িক কবি গালিবে অনুপস্থিত; এবং সেটা খুব আশ্চর্য নয়। উর্দু সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী আগ্রা লখ্নৌ থেকে সমুদ্র হাজার মাইল দূর, হিমালয় অপেক্ষাকৃত নিকট হ'লেও দেড়শো-দু'শো মাইল পার হ'তে হয় তার মহিমা উপলব্ধি করার জন্য। তখন, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যানবাহনের ব্যবস্থা এমনই ছিলো যে উর্দু কবিদের পক্ষে হিমালয় ভ্রমণ ক'রে আসা আজকালকার অনেক বাঙালী কবির পক্ষে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে আসার চেয়ে কম দুঃসাধ্য ছিলো না। আশেপাশে এই কবিরা দেখতে পেতেন ধূ-ধূ-করা মাঠ, কোথাও-কোথাও কৃষিক্ষেত্র এবং যমুনার মতো ক্ষীণপ্রাণ শীর্ণকায় নদী। সেই যমুনারই তীরে ছিলো শাহজাহানের মর্মবেদনা-ব্যঞ্জক এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের নিদর্শন, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো, কিন্তু উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবির গজলে সাড়া জাগাতে পারেনি। অবশ্য একজন উর্দু কবি তাজমহল সম্পর্কে বলেছেন: "এক শাহন্শাহ্-নে দৌলৎ-কা সহারা লেকর / হম গরীবোঁ-কী মুহব্বৎ-কা উড়ায়া হৈ মজাক।" ("এক শাহন্শাহ অঢেল ধনভাণ্ডারের সুযোগ নিয়ে আমাদের মতো সামান্য লোকের প্রেমকে উপহাস করেছেন।") তবে এ-শের-এর ভাব ও ভাষা

হাল আমলের, গালিবের সময়কার নয়।* এই সূত্রে আর-একটি প্রতিতুলনা এখানে উল্লেখ্য। উর্দু কবিদের রচনায় 'বীরানহ্‌' শব্দটি বহুব্যবহৃত, বাংলায় তার প্রতিশব্দ খুঁজে পাই না। না-পাওয়ার কারণ ভৌগোলিক। বীরানহ্‌ বলতে আমার মনে ছবি জাগে ফাটল-ধরা ধূলিধূসরিত দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, যা শুধু জনশূন্য নয়, পশুপক্ষী-বর্জিতও। আমাদের এই বাংলাদেশে সবুজের সমারোহ এতোই অপর্যাপ্ত যে জনশূন্য প্রান্তরেও জংলি ফুল ফোটে, নানারকমের পাখীর কলগীতি শোনা যায়। বাংলাদেশে বীরানহ্‌ কোথায় যে বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দটার প্রয়োজন বোধ হবে?

বাগান আর ফুলের কথা অবশ্য উর্দু গজলে ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু সে-ফুলগুলি প্রায়শই কাগজের ফুল, অর্থাৎ প্রাক্তন কাব্যের পাতা থেকে তুলে-আনা, ইরাণ থেকে ঐতিহ্যবাহী সড়কে কবি-পরম্পরায় আমদানী করা। তাই লালহ্‌ ও গুল, নার্গিস ও য়াসমীনের পৌনঃপুনিক উল্লেখ উর্দু গজলে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ঠেকে।

বিতর্ক উঠেছে, গালিব ও সমসাময়িক উর্দু কবিদের প্রেমকাব্যের প্রকৃত পাত্র কে? বিতর্কের অবকাশ অবশ্য আছে। ফারসী কাব্যে সাকীই প্রধান প্রেমপাত্র এবং সাকী একজন সুন্দর তরুণ, কদাচ তরুণী নয়। উর্দু কাব্যেও সাকীর উল্লেখ অপর্যাপ্ত। গালিবও কি তবে একজন বা একাধিক জন নেশা-ধরানো রূপবান তরুণের প্রেমে প'ড়ে কিম্বা প্রেমের কল্পনায় ম'জে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতাগুলি লিখেছিলেন? ইতিবাচক উত্তরের সপক্ষে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণও পেশ করা যায়। প্রেমাস্পদের কোনো কর্মের কথা বলতে গিয়ে যে-ক্রিয়ারূপটি ব্যবহার করেছেন তা সর্বত্রই পুংলিঙ্গ, যথা—

* শেরটি আমি শুনি পুরুষোত্তম লালের মুখে, ভিন্ন কথা প্রসঙ্গে।

"আ-হী জাতা বোহ্ রাহ পর", "আ-হী জাতী" নয়। দ্বিতীয়ত, রূপের বর্ণনায় চুল কপাল কপোল চোখ পক্ষ্ম ভুরু ঠোঁট কোমরের স্তুতি ক'রে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু নারী-দেহের কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গের (স্তন, নিতম্ব, উরু) উল্লেখমাত্র নেই, ইত্যাদি।

তবে রুমী, খৈয়াম, হাফিজাদির কয়েক শতাব্দী পর মীর, মোমিন, দর্দ্, সওদা, গালিবের আবির্ভাব। ইতিমধ্যে সুরাপাত্র, প্রেমের পাত্র এবং প্রেমের মজলিসের চেহারা পাল্‌টে গেছে। কবিতার ভাষা যেখানে গতানুগতিক সেখানেও মেজাজে এবং পরিবেশে কিছু নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মুসলিম সভ্যতা এবং ফার্সী ও উর্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল দিল্লী আগ্রা লখ্‌নৌতে তওয়ায়েফরা এসেছেন, মহাসমারোহেই এসেছেন। তাঁরাই হ'য়ে উঠেছেন সৌখীন সব মজলিসের অনুপ্রাণনার উৎস। সে-সব মজলিসে উচ্চপর্যায়ের রাজপুরুষরা ধনীরা কবিরা এবং সঙ্গীতকাররা যাওয়া-আসা করতেন। গালিবও। মানী যাঁরা স্বয়ং উপস্থিত হতেন না তাঁরাও অনেক সময়ে তাঁদের তরুণ পুত্রদের পাঠাতেন সোহ্‌বৎ অর্থাৎ আদব-কায়দা-দোরস্ত ভাষা ও আচরণ আয়ত্ত করবার জন্য, ঘষা-মাজা শানানো ও চটকদার বাক্‌বিনিময়ে পটুতা অর্জন করবার জন্য।

পর্দাপ্রথা তখন এমন কড়া ছিলো যে নিকট আত্মীয়া এবং মজুরশ্রেণীর মেয়ে ছাড়া আর-কোনো নারীর মুখ দেখারই সুযোগ ছিলো না, আলাপ-পরিচয় ক'রে প্রেমে পড়া তো অনেক দূরের কথা। তওয়ায়েফরা এই সামাজিক পরিস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করেনেনি। হৃদয় জয় ক'রে বিবাহ করা,ঘর-সংসার করা, ইত্যাকার দায়দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে তাঁরা হ'য়ে উঠলেন বিশুদ্ধ রূপসী, হৃদয়হরণের ছলা-কলায় বিশেষজ্ঞ, পুরুষ-হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় অতিশয় দক্ষ।

এক মজুরশ্রেণীর সুন্দরী ডোম্‌নীর সঙ্গেই গালিবের প্রথম নিবিড় প্রেমের অধ্যায়টি রচিত হয়। গালিব তখন যুবক, ধনী না-হ'লেও বেশ সচ্ছল এবং অতিশয় রূপবান ছিলেন। ডোম্‌নী সহজেই সাড়া দিলো অন্য সব প্রেমিককে ত্যাগ ক'রে একমাত্র গালিবের প্রেমেই দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করবে ব'লে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'লো। গালিবই প্রতিশ্রুতির মান রাখতে পারলেন না। ডোম্‌নীর উষ্ণ আলিঙ্গনে ক্রমশ ক্লান্ত হ'য়ে রূপে-গুণে উন্নততর প্রেমিকার সন্ধানে তওয়ায়েফদের মহফিলে যাতায়াত শুরু করলেন। মনের কষ্টে এবং সে-কষ্টজনিত কোনো শারীরিক পীড়ায় ভুগে-ভুগে ডোম্‌নীটি অল্পকাল পরে মারা গেলো। গালিব গভীর দুঃখ পেলেন, এবং বেশ-কিছুকাল অনুশোচনা করলেন যে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই এই একনিষ্ঠ প্রেমিক অকালে মৃত্যুবরণ করলো। তার স্মরণে কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখলেন। ঐ পর্যন্ত। এর পর থেকে গালিবকে তওয়ায়েফ-প্রেমিক বলা যায়। এই তওয়ায়েফদের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষণিক প্রত্যনুরাগ, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অবমাননা, অবহেলা, উদাসীনতা এবং নানাপ্রকার যাতনার অনুভূতিই হ'য়ে উঠলো তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য।

উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত মনীষী অধ্যাপক মুহম্মদ মুজীব 'গালিব, উর্দু কলাম-কা ইন্তখাব' নামক মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন, তৎকালীন ভদ্র সমাজে বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে: "ভদ্রাঙ্গনাদের অবাধে দেখতে পাওয়ার ফল হবে বাচনিক পরিচয়, বাচনিক পরিচয়ের ফল হবে শারীরিক স্পর্শ এবং শরীর স্পর্শ করলে আত্মসংযম রক্ষা করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হবে না, সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।" সুতরাং পর্দাপ্রথা এতোদূর বিস্তৃতিলাভ করলো যে কাব্যেও নারীর উল্লেখ অশালীন ব'লে বিবেচিত হ'লো। প্রেমের কবিতায় কবি এমন-কিছু লিখতে পারবেন না যাতে বোঝা যায় তাঁর প্রেমাস্পদ পুরুষ কি নারী। সেই

কারণে প্রেমের কবিতার পাত্রী তওয়ায়েফ হ'লেও ব্যাকরণে ও রূপ-বর্ণনায় সে-কথাটা গোপন থাকতো। তবে একটু তলিয়ে দেখলে হাবভাবের ও চারিত্র্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে প্রেমপাত্র নারী, শুধু নারী নয়, তওয়ায়েফ; এবং সুরা ও প্রেমের মজলিস তারই নাচঘর। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসও এ-অনুমান সমর্থন করে। এই শালীনতাবোধ—যার আওতায় সমযৌন-প্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যে সমাদৃত হ'লো এবং নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা বহিষ্কৃত হ'লো বা প্রচ্ছন্ন রইলো—আমাদের আজকের রুচিতে যতোই অদ্ভুত ঠেকুক, তাকে অস্বীকার করবার জো নেই।

গালিবের পার্থিব প্রেমে যে লঘুগুরু রসের আমেজ, যে-চাতুর্য—শুধু বাক্‌চাতুর্য নয়, ভাবচাতুর্যও—দেখা যায় সেটা তাঁর অপার্থিব প্রেমভাবনায় প্রতিফলিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো কথাটা স্পষ্ট হবে। "ফরিশ্‌তাদের লেখার উপর ভর ক'রে আমাকে অন্যায়ভাবে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দেবার জন্য; / লিখবার সময়ে আমার পক্ষের লোক কি কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো?" মুসলমানদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে দুই ফরিশ্‌তা (দেবদূত) ব'সে আছেন; পাপ করলেই বাঁ কাঁধের ফরিশ্‌তা সেটি লিখে রাখেন, কোনো পুণ্যকর্ম করলে ডান কাঁধের ফরিশ্‌তা সেটি তালিকাভুক্ত করেন। কেয়ামতের দিন এই দুটি তালিকা মিলিয়ে হিসাবনিকাশ ক'রে আল্লাহ্‌ স্বর্গ বা নরকবাসের মেয়াদ ধার্য করেন। গালিব যেন খোদার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বলছেন: তোমার প্রেরিত লোকেরা তালিকা প্রস্তুত করার সময় মিথ্যা কিংবা ভুল কথা লেখেনি তা আমি মানবো কেন? আমার পক্ষের কেউ তো উপস্থিত থেকে সায় দেয়নি যে, হ্যাঁ, ঠিক লেখা হয়েছে। খোদার বিচারও যেন ফৌজদারী আদালতের বিচার, দৈবী সাক্ষীকেও প্রমাণ দিতে হবে যে সে সত্যবাদী।

অন্য-একটি শের-এ গালিব বলছেন, প্রিয়ার নিষ্ঠুরতায় তিনি দেখেছেন

বিধাতার নিষ্ঠুরতার আদল ; উলটো ক'রে বললে— বিধাতার নিষ্ঠুরতায় তিনি অনুভব করেছেন প্রিয়ার নিষ্ঠুরতার আদল— আমরা কবিমানসের অন্য দিকটা এবং এক হিসেবে গুরুতর দিকটা ঠাহর করতে পারি। প্রিয়া তাঁর রূপে-গুণে (নাকি পরমপ্রিয় তাঁর সৃষ্ট জগতের রূপে-গুণে ?) জাগিয়ে তোলেন লক্ষ বাসনা, অথচ ঐ-বাসনারাশির ভগ্নাংশও পূর্ণ করার কোনো অভিপ্রায় নেই তাঁর, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্মম। কবির মনে হতাশ প্রশ্ন জাগে— হে ঈশ্বর, আমাকে আর-কিছুই যখন দেবে না তখন একটি বাসনাহীন হৃদয় দিলে না কেন ? কিন্তু গালিব বাসনার নিবৃত্তি চাননি ; বলছেন, আমি যখন কবি তখন আমার বাসনার রঙের খেলা ও রূপের বাহার দেখবো এবং রসের ভাষায় ব্যক্ত ক'রে সবাইকে দেখাবো ; ঐ-সব বাসনা কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা সে-কথা অবান্তর। দৈনন্দিনের মানবিক সত্তা এবং দুর্লভ শুভলগ্নের কবিসত্তার মধ্যে এমনতর টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্ব তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র গালিব বলছেন, আমি চাইবো না কেন, তুমি যখন সব দিতে পারো তখন আমি সব-কিছুই চাইবো তোমার কাছে, আমার প্রার্থনাকে সেই সাহস, সেই বল দাও। আবার সুর পালটে বলছেন, না-চাইতে যা পাওয়া যায় তার স্বাদ, তার মূল্য আলাদা ; সেই ভিখারীই শ্রেষ্ঠ ভিখারী, হাত পাতার অভ্যাস হয়নি যার। আমি চাইবো না অথচ তুমি দেবে— এই হোক্ আমাদের অনুরাগ-রঞ্জিত আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

গালিব ও তাঁর খোদার মধ্যে বিশ্রম্ভালাপের সুর স্বতন্ত্র, ভাষা ভিন্ন ; রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের বিরালাপের সঙ্গে মেলে কোথাও-কোথাও, কিন্তু মেলে না তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে, ঝড়-ঝঞ্ঝা, গিরি-নদী পার হ'য়ে আসছো, এসে পৌছবেই একদিন, সে-দিন যদি-বা আমার ঘরের (বা অন্তরের) দরজা বন্ধ থাকে তবে প্রবল আঘাতে

দরজা ভেঙে আসবে—এ দৃঢ় প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের গানে বার-বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গালিবের পক্ষে এ এক পরম আশ্চর্য, পরম অবিশ্বাস্য ব্যাপার। "তিনি এলেন আমার ঘরে"—আমি কি স্বপ্নের ঘোরে আছি, "আমি একবার তাকাই তাঁর মুখের দিকে, একবার আমার ঘরের দিকে" আর ভাবি এই অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে মুহূর্তের জন্যে সম্ভব হ'লো। আসবার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন কখনো-কখনো, আমি সারাক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি তাঁর প্রতীক্ষায়; কিন্তু তিনি আসেন না। বুঝতে পারি, আমাকে আমার বাড়ির দরজায় দারোয়ান ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখে কৌতুক করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো। অথবা, আরও মর্মান্তিক, তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েন গভীর রাতে রকীবকে (প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে) সঙ্গে নিয়ে, আমার বিরহ-যন্ত্রণাকে ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ ক'রে দিয়ে যাওয়ার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় রকীবকে আমরা খুঁজে পাই না; গালিবের অনেকগুলি প্রেমের কবিতায় তিনি অত্যন্ত উপস্থিত। ঈশ্বর সব মানুষকে ভালবাসতে জানেন না, কয়েকজন ভাগ্যবানই তাঁর করুণাকণা কুড়িয়ে পান। সেইটুকুর জন্য কবি কাতর। একটি শের-এ অবশ্য গালিব বলছেন—"ঈর্ষা বলে অন্যের সঙ্গে তোমার ভাব, / বুদ্ধি বলে সে নির্দয় কারো সুহৃদ হ'তে পারে না।" সর্বত্রই সৌহার্দ্য খামখেয়ালী ও ক্ষণিক, নির্দয়তার দীর্ঘ ইতিবৃত্তে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি বিরামচিহ্ন যেন। গালিবের প্রায় বিপরীত মেরুর কবি ইকবাল বন্দা ও আল্লার মধ্যে প্রেম প্রসঙ্গে রকীবের প্রত্যয়টি বেশ-একটু নতুনভাবে এনেছেন। ইকবাল অবশ্য ব্যক্তিমানুষের কথা ভাবছেন না, মানব-সমাজের দিকেই তাঁর সমূহ মনোযোগ, এবং সে-সমাজ অবশ্যই ধর্মভিত্তিক। কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্ত মুসলিম ধর্মসম্প্রদায় ছিলো আল্লার বরেণ্য সম্প্রদায়, কিন্তু আধুনিককালে দেখা যায় পশ্চিম য়োরোপের খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় আল্লার

পক্ষপাতী প্রীতিলাভ করেছে। তারাই এখন সৌভাগ্যবান রকীব। এই প্রসঙ্গের আলোচনা দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকায় করেছি।

"আর পাব কোথা / দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে, সব ঈশ্বর-প্রেমী কবি সম্বন্ধেও বলতে পারতেন; নিজের প্রেমের রূপান্তর বিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে। ("একেই বলো ভালোবাসা ? আমার ভালোবাসার লোক কই ? আমি ভালোবাসি অনেককে। কিন্তু 'মানসী'-তে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি ?")

গালিব, অন্তত কবি গালিব, তাঁর ঈশ্বরের ভাবচ্ছবি রচনা করেছিলেন তওয়ায়েফ-প্রেমে উপলব্ধ উপাদান দিয়ে। তওয়ায়েফ বলতে আজ আমাদের মনে অবজ্ঞা জাগে, গালিবের সময় জাগতো না। রূপে তো এঁরা অনন্যা ছিলেনই, নৃত্য গীত বাক্‌পটুতা ইত্যাদি গুণেও সেরা ছিলেন। এই গুণগুলিকে অবশ্য বলা যেতে পারে নান্দনিক গুণ (aesthetic quality)। চারিত্র্যনৈতিক গুণ (moral quality) তওয়ায়েফদের মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। তাই গালিবের ঈশ্বরভাবনায় নান্দনিক গুণের প্রাচুর্য দেখি এবং চারিত্র্যনীতিক গুণের অপ্রতুলতা। সর্বজীবের প্রতি, অন্তত সকল মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও প্রীতি অপার, পিতার মতন শাসন করলেও তিনি পিতার মতনই স্নেহশীল, তাঁর বিধান সর্বতোভাবে মঙ্গলময় ও ন্যায়নিষ্ঠ, অমঙ্গল বা অন্যায় আমরা যা দেখি সেটা আমাদেরই আংশিক দৃষ্টির বিভ্রম—এমন ভাবধারা গালিবের মনে দানা বাঁধেনি, অন্তত কাব্যে তার প্রকাশ অত্যন্ত বিরল ; ঈশ্বরের রূপের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। গালিব অনেক শের-এ ঈশ্বরের রূপকে রূপের পরম বা পরাকাষ্ঠা বলেছেন। সেই পরমরূপের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে

দেখেছেন যতোটা মানুষের রূপে ততোটা দেখেননি। প্রতিতুলনায় গালিব রূপসীদের মধ্যেই পরমরূপের আভাস পেয়েছেন বেশি। "সব নয়, অতি অল্পই লালহ্ ও গোলাপের মধ্যে রূপ নিয়েছে, না-জানি কী রূপসীই ছিলেন যাঁরা এই মাটির তলায় চাপা প'ড়ে আছেন।" সুন্দরী নারীর রূপের অত্যল্পভাগ মাত্র পেয়ে যেমন ফুলগুলি এতো সুন্দর, তেমনি পরমরূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র আমরা দেখতে পাই রূপসী নারীর মনোহরণ রূপে।

প্রাসঙ্গিক অন্য-একটি শের আমাকে ভাবিয়ে তোলে: "হে অপরিণামদর্শী হৃদয় আমার, অভিলাষ সংবৃত করো, / বন্ধুর রূপের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করবার শক্তি তুমি পাবে কোথায়?" ঈশ্বরকে প্রায় সব ধর্মশাস্ত্রেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হ'য়ে থাকে। গালিব কি সেই প্রাচীন কথাই নতুন ক'রে বলতে চান? বলতে চান সে-জ্যোতি এতোই প্রচণ্ড যে মানুষের চর্মচক্ষু তথা মনশ্চক্ষু তার সাক্ষাৎ দর্শন সইতে পারে না; অতএব ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানের জন্য বৃথা অভিলাষ সম্বরণ ক'রে যে অর্তাব সীমিত জ্ঞান বা বোধি মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যায়ত্ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকা সঙ্গত? নাকি গালিব রবীন্দ্রনাথের মতন আরও দুঃসাহসিক কিছু বলতে চেয়েছেন? 'রাজা' নাটকে রাজা (যিনি ভগবানের প্রতীক) তাঁর প্রেমিকা রাণী সুদর্শনার কাছে আসেন রাত্রিকালেই ঘুটঘুটে অন্ধকার কক্ষে। রাণী তাঁকে দিনের আলোয় দেখবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে রাজা উত্তর দেন, "তুমি আমায় দিনের আলোয় (অর্থাৎ লোকালয়ে) দেখলে আমার রূপ সহ্য করতে পারবে না।" সে-রূপ প্রচণ্ড জ্যোতির্ময় ব'লে সুদর্শনার সহ্য হবে না এ-কথার উপর কিন্তু নাটকে জোর দেওয়া হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে এই কথার উপর যে রাজা একদিকে যেমন মধুর ও মনোহর, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। তাঁর এ সমগ্র রূপ সহ্য করবার শক্তি সুদর্শনা তখনও লাভ করেনি; তাই রাজার দর্শন পাবার সে যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, ঠাকুরদা পর-পক্ষ

পাঁচটি ছেলে হারিয়ে কঠিন সত্যকে সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেছেন, তাই তিনি রাজাকে দিনের আলোতেই দেখতে পান এবং বন্ধু ব'লে সম্বোধন করতে পারেন। গালিবের পূর্বোদ্ধৃত শের-এর এমনতর অর্থ করা যায় কি? এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে এটা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় পৃথিবীময় দুঃখের যে "অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ" দেখেছিলেন, পরে আরও বিদীর্ণ হৃদয়ে দেখেছিলেন নাৎসী বর্বরতার সংবাদ পেয়ে, গালিব তা দেখেননি। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্র ধ'রে উভয়পক্ষের বর্বরতা তাঁকে খুব বিচলিত করেছিলো, তাঁর চিঠিপত্রে আমরা সে-কথা জানতে পারি। কিন্তু গালিবের কাব্যে তার স্বাক্ষর তেমন গভীর ও পরিব্যাপ্ত নয় যেমন রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের উপর দেশে-দেশে বিস্তৃত নৃশংসতার স্বাক্ষর।

আগেই বলেছি, গালিব সমাজমুখী কবি নন, তাঁর কাব্যের উপজীব্য তাঁর নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাগ্যের উত্থান-পতন। সেইখানে তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের খামখেয়ালীপনা কৌতুকপ্রিয়তা নিষ্ঠুরতা এবং উদাসীনতা। তাঁর কয়েকটি শের-এ দেখি তিনি প্রিয়ার কাছ থেকে তথা ঈশ্বরের কাছ থেকে আর সব-কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু উদাসীনতা সইবার শক্তি তাঁর নেই। আমি নিজে অবশ্য বুঝতে পারি না জীবনের কোন দুঃখ-কষ্টকে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা বলা যায় এবং কোনটাকে তাঁর উদাসীনতা। আমরা যদি বিশ্ববিধানের পিছনে কোনো বিধাতাপুরুষের অস্তিত্ব মানি, তবে যে-কথা খোলা চোখে এবং মুক্তবুদ্ধিতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে সেটা এই যে বিধাতার উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক্, ব্যক্তিমানুষকে সুখী করা বা সুখে রাখা নয়। উদাসীনতাই নিপট সত্য, 'নিষ্ঠুর' বলার মধ্যে খানিকটা আবদারের ভাব রয়েছে। যখন বিশেষ কোনো সৌভাগ্যকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নিই অথচ শেষ মুহূর্তে তা থেকে বঞ্চিত হই তখনই ব'লে উঠি—হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হ'লে কেন?

মানুষের জীবনে সমূহ সুখ-দুঃখ বিশ্বজাগতিক নিয়মেই ঘটে এবং নিয়মকে নিষ্ঠুর বা করুণাময় বলার কোনো মানে হয় না। নিয়ম যদি ঈশ্বরের রচনা হয় তবে তিনি পরম ভক্ত, মহান হিতকর্মী, প্রতিভাবান জ্ঞানী ও শিল্পীর বেলাতেও লেশমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাতে, নিয়মের কঠোরতম আঘাত-জনিত যন্ত্রণা থেকে তাঁদের রক্ষা করতে অনিচ্ছুক। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, স্পিনোজা, কীট্‌স্‌, বেঠোফেন, হোল্‌ডার্লিন, ফ্রয়েড, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য— কতো নাম করবো। আমরা সবাই জানি কতো বৎসর ধ'রে এঁদের বুকের উপর শারীরিক যন্ত্রণার বা পঙ্গুতাজনিত মানসিক যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলেছিলো, তবে বিধাতার কী অভিপ্রায় তাতে সিদ্ধ হ'লো তা কেউ জানে না। প্রাকৃতিক নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা বিশ্বে এই অর্থহীন যন্ত্রণা অবধারিত। নিয়মের যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন তবে তাঁর করুণা প্রীতি ক্রোধ নিষ্ঠুরতা সবই সম্পূর্ণ গোপন রয়েছে কঠিন নিয়মের অন্তরালে। আমাদের মুখোমুখি আছে কেবল উদাসীনতা, বধিরতা, নিরুত্তরতা: "এদিকে আমি— শত সহস্র আর্তনাদ, / ওদিকে তুমি— এক পরামশচয না-শোনা।"

ভল্‌টেয়র কোনো বন্ধুকে এক পত্রে লিখেছিলেন: আমি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো আঘাত পাই, তখন আমার শাণিত বিদ্রূপবাণের দ্বারা দ্বিগুণ প্রত্যাঘাত করতে বিলম্ব করি না ("I get a hundred pikethrusts, I return two hundred and I laugh.")। তেমনি প্রত্যাঘাতের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত গালিবের একটি আশ্চর্য সার্থক এবং সরল শের: "আমি কী এমন জ্ঞানী ছিলাম, কোন্‌ গুণেই-বা সেরা ছিলাম, / অকারণে, আসাদ, আসমান আমার শত্রু হ'লো।" যেন এটা অবধারিত সত্য যে মানুষের মধ্যে যারা সেরা গুণীজ্ঞানী তাঁরা ঈশ্বরের কুনজরে পড়বেনই; ঈশ্বর মানুষের ভালো দেখতে পারেন না, উন্নতি বরদাস্ত করতে পারেন না। কবি ঈষৎ কৃত্রিম বিনয় সহকারে বলছেন—

আমি তো সেরকম কিছু নই, তবু ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি আমার উপর পড়লো কেন ?

"নহ্‌ থা কুছ তো খুদা থা, কুছ নহ্‌ হোতা তো খুদা হোতা, / ডুবোয়া মুঝ-কো হোনে-নে, নহ্‌ হোতা মৈঁ তো কেয়া হোতা" ("যখন কিছুই ছিল না তখন খোদা ছিলেন, কিছু না-হ'লেও খোদা তো থাকতেনই ; / হওয়াটাই আমাকে ডুবিয়েছে, আমি যদি না-হতাম তবে কী হতাম" – অর্থাৎ খোদা হতাম ; অথবা "যা-কিছু প্রত্যক্ষ করি তা নাস্তির নাস্তিত্ব, / যাকে জাগা মনে করি সে-ও স্বপ্ন, জেগে ওঠার স্বপ্ন") । এইধরনের একাধিক শের গালিব রচনা করেছেন, তবে দুটো-চারটে ব্যতিক্রম ছাড়া আমার মতে সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি, তত্ত্বকথা কিংবা খেয়ালি-বিলাসই থেকে গেছে । সেটা কিন্তু গালিবের অক্ষমতা নয়, ভাষারই অক্ষমতা । সমস্ত বিশ্বজগৎ আমারই মনের সৃষ্টি, কিংবা "অনল হক" (আমিই পরমেশ্বর), "অহম্‌ ব্রহ্মাস্মি" – এ-সব কথা আজকের কথা নয় তবে আজও তা ঠিক কথা হ'য়ে উঠতে পারেনি । এমনতর উপলব্ধি যদি অলীক না-হয়, তবু তা একান্তই যোগলব্ধ ও যোগলভ্য, মুনীর (মৌনব্রতীর) বক্ষেই তার সঙ্গত স্থান । দার্শনিকরা যুক্তির ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, কবিরাও তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন রসের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে । সত্যের সীমা না-থাকলেও কথার একটা সীমা আছে । কথার সাধক যাঁরা এবং যাঁদের সাধনা একান্তভাবে কথার উপরই নির্ভরশীল, তাঁদের সেটা মেনে চলাই ভালো । ভালো, তবু দার্শনিকরা কবিরা কথার সীমানা ছাড়িয়ে কথা কইবার লোভ সংবরণ করতে পারেননি । এই অসম্বৃত্তির ফলে হয়তো খুব ধীরে-ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ভাষার সীমানা একটু-একটু ক'রে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত হয়েছে । তথা লাভ ।

আসল কথা হচ্ছে যে অদ্বৈতবাদ কিংবা অদ্বৈতবোধ কবির স্বধর্ম নয় ।

কবিকে প্রেমিক এবং প্রেমিককে দ্বৈতবাদী হ'তেই হয়। প্রেমিক চায় নিবিড়তম মিলন, আত্মবিলোপ বা তাদাত্ম্য নয়। অবশ্য ইরাণের একজন শ্রেষ্ঠ কবিই বলেছেন: "মন তূ শুদম্ তূ মন শুদী, মন তন শুদম্, তূ জান্ শুদী ; / তা কস্ নহ্ গোয়দ বাদ অজ্ ঈঁ, মন দীগরম, তূ দীগরী।" ("আমি তুমি হ'য়ে যাই, তুমি আমি হ'য়ে যাও ; / পরে যাতে কেউ না-বলে আমি আর তুমি ভিন্ন।") কিন্তু এটা কবিতার ভাষা ; অলংকৃত এবং অতিরঞ্জিত। রামকৃষ্ণ তাঁর প্রাকৃত বাংলায় যা বলেছিলেন সেটা প্রেমিক হৃদয়েরই খাঁটি কথা, বৈদান্তিকের তত্ত্ববিলাস নয়: "আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হ'তে চাই না।"

উপরে দুটি-চারটি ব্যতিক্রমের কথা বলেছি, তার উদাহরণ এই শেরটি: "প্রিয়ের শোভা ব্যতীত এ-মহাবিশ্ব আর-কিছু নয়, / আমি হতামই না যদি পরম সুন্দর নিজের রূপ দেখতে না-চাইত।" ভাবটি দার্শনিকসুলভ শোনায়, কিন্তু আসলে তা কবিরই ভাব, কবিতার ভাষাতেই প্রকাশিতব্য, দার্শনিক যুক্তিবিচার-সহ নয়। (এখানে 'ভাব' শব্দটি যে-অর্থে আমি ব্যবহার করছি তার মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতি একাকার হ'য়ে মিশেছে।) এই শের-এর ভাবটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বার-বার আবর্তিত হয়েছে। সম্ভবত যৌবনকালে রচিত একটি গানে পাই "আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি / দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি" ; আয়ুর শেষ প্রহরে লেখা 'শ্যামলী'র "আমি"-শীর্ষক গদ্যকবিতাটিতে দেখি এই ভাবেরই বিস্তার। কবিতাটির ক্রমবিকাশ মন্থর কিন্তু অব্যর্থ। আরম্ভ হয় দার্শনিক তত্ত্বকথায়: "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ", ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন বটে "একে বোলো না তত্ত্বকথা", তবু তত্ত্বকথাই আরো-একটু কাব্যমণ্ডিত হ'য়ে এগিয়ে চলে। এবার বৈজ্ঞানিকের অবতারণা, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়: প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন পৃথিবী ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে, মানুষ আপন কীর্তির "অমরতার ভান" নিয়ে নাভিশ্বে

বিলীন হবে। কিন্তু বিদায়কালে জগৎ থেকে "নিকিয়ে নেবে সব রঙ···ছানিয়ে নেবে সব রস।" পরের ভাব-পর্বটি কবিতারই এলাকাভুক্ত। বর্ণহীন রসহারা বিশ্বে বিশ্ববিধাতার কি কোনো আনন্দ থাকবে? তাঁকে আবার যুগ-যুগান্তর ধ'রে তপস্যা করতে হবে মানবসৃষ্টির জন্য, জড়জগতের মধ্যে তিনি আবার মানুষকে ডাকবেন, বলবেন: "বলো, তুমি সুন্দর", বলবেন, "বলো, আমি ভালোবাসি।" মানুষের সৌন্দর্যবোধের জন্য, মানুষের বিশ্বপ্রেমের জন্য ব্যাকুল এই বিশ্বরচয়িতা উপনিষদের পরব্রহ্ম নন, প্রচলিত কোনো ধর্মশাস্ত্রের পাতায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো, গালিবের মতো, কবির অনুভবেই সত্য। কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতা ঐকান্তিক, সেইজন্য যাতনাময়; রাধার প্রেমের জন্য কৃষ্ণ একাধারে আগ্রহী এবং উদাসীন। বিরহিনী রাধার তীব্র বেদনা আমাদের খুবই চেনা, কিন্তু বিরহী কৃষ্ণের একাকীত্ববোধ, স্পষ্ট হয়নি মহাজন পদাবলীতে—যেমন স্পষ্ট হয়েছে মানবহীন বিশ্বে বিধাতার নিরানন্দ (boredom ?) রবীন্দ্রনাথের "আমি" কবিতাটিতে। একই ভাববৃক্ষের তিনটি ফল, কিন্তু প্রত্যেকটির স্বাদ আলাদা।

গালিবের শের-এ দেখি বিশ্বস্রষ্টা আত্মদর্শনপ্রিয়, তাই চক্ষুমান জ্ঞানবান মানুষকে সৃষ্টি করলেন নিজের বিশ্বময় রূপ দেখবার জন্য। এ-দেখা নির্লিপ্ত দেখা। কিন্তু ভগবান আরও-কিছু চান, তিনি চান তাঁর এই বিশ্বরূপী শিল্প-বস্তুটির গুণগ্রহণ, রসাস্বাদন। উপনিষদের কবি যখন বললেন "দেবস্য পশ্য কাব্যম্", তখন বিশ্বরচনাকে কাব্যরচনার সঙ্গে তুলনা ক'রেই তিনি তাঁর নান্দনিক গুণগ্রহণ প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণ (বিশ্বময় অবতীর্ণ বিশ্বস্রষ্টা) রাধার (অর্থাৎ মানুষের) প্রতি উদাসীন থাকলেও তার দেহমনের ব্যাকুলতায় এবং আত্মসমর্পণে সবিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের "আমি" কবিতাটিতে মানুষের সৃষ্টি ও বিলোপের কথা বলা হয়েছে, বলা

হয়েছে যে মানবলুপ্ত বিশ্বে বিশ্বস্রষ্টার কোনো আনন্দই নেই, একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হ'য়ে তাঁকে আবার মানবসৃষ্টির পর্ব সাধন করতে হবে, মানুষের রসবোধরিক্ত বিশ্ব তাঁর কাছেও একেবারেই অর্থহারা। ভগবানের boredom-এর কথা ইতিপূর্বে কোনো কবি বলেছেন কি? যেমন আশ্চর্য তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ এই কল্পনা।

গালিব রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ের দার্শনিক ছিলেন না, তাঁর কবিপ্রতিভাও রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য নয় আমার বিচারে। তবু তাঁর কয়েকটি গজলের এবং অনেক-অনেক শের-এর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করবেন সহৃদয় পাঠক, অনেক শের-এর ঘনীভূত হাস্যরসে পুলকিত হবেন, অনেক শের-এর শব্দবিন্যাসে অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ ক'রে মুগ্ধ হবেন, বেশ কয়েকটি শের-এর গভীর ও বিশাল মর্ম হৃদয়ঙ্গম ক'রে সেই দুর্লভ আনন্দলাভ করবেন যাকে প্রকৃত অর্থে রসানন্দ বলা যায়--যদিও কাব্যবাহিত অনুভূতি তিক্ত দুঃখের কিংবা বিষণ্ণ নৈরাশ্যের।

সমালোচনার উত্তর-প্রসঙ্গে

শ্রীরাজেন উপাধ্যায়ের সৌজন্যপূর্ণ পত্র ('দেশ', ১৬ আগস্ট ১৯৭৫) পড়তে গিয়ে গোড়াতেই সামান্য একটু হোঁচট খেলাম। তিনি আমার প্রবন্ধের শিরোনাম "গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা"কে পাল্টে লিখেছেন: "গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনা"। এটা কি লেখনাপ্রমাদ, স্মৃতিপ্রমোষ, নাকি তাঁর মনে হয়েছে শব্দদুটির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক যে 'ভাবনা'র জায়গায় 'চেতনা' লিখলে কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না? হয় কিন্তু। "আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনার মাঝে/তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে"— এখানে 'ভাবনা'কে 'চেতনা' পড়লে পংক্তিটি যে ধ্বনির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যদিও ছন্দ ঠিকই থাকে) শুধু তাই নয়, অর্থের দিক দিয়েও বেশ-কিছু হারায়। 'ভাবনা' অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান শব্দ।

শ্রীউপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও পূজা পর্বের গান গুলিয়ে না-ফেলতে উপদেশ দিয়েছেন। কবুল করছি যে 'প্রায়শ'ই না-হ'লেও মাঝে-মাঝেই আমি গুলিয়ে ফেলি। এই গুলিয়ে ফেলার বদ্ অভ্যাসটি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পাওয়া। হাফিজের ভাষায় বলি: "বন্ধুর রূপের ঔজ্জ্বল্য কিছুটা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে,নইলে আমি তো তেমনি ধুলোমাটি হ'য়ে থাকতাম যেমনটি ছিলাম।" "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার", "তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে" জাতীয় 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গানকে কি প্রেমের গান হিশেবে ভাবতে কোথাও বাধে? শেষোক্ত গানটি তো 'গীতবিতান'-এর "প্রেম" পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। "প্রেম" পর্বে অন্তর্ভুক্ত আর-একটি অপূর্ব গান, "আহা তোমার

লয়ে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়" কি "পূজা"র গানও নয়? "আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে", "আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা" কি প্রেমের গান না পূজার গান? "সকল জনম ভরে কাঁদি কাঁদাই তোরে" কি পূজার গান, না নিবিড় দাম্পত্যপ্রেমের গান? এমনতরো ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে নারীপ্রেম 'গুলিয়ে ফেলা' ভাবের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গানের মধ্যে গণ্য হ'তে পারে যে-কোনো নিরিখে। তার সঙ্গে যদি প্রকৃতি-প্রেমেরও আমেজ ঘটে তবে তো কথাই নেই।

"আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে॥
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায়নি খুঁজি—
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে—
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার॥"

এই অত্যুৎকৃষ্ট গানটি কোন পর্বে পড়ে—"প্রকৃতি", "প্রেম" না "পূজা"? "প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে" গ্রীষ্মঋতুর গান ব'লেই পরিচিত, কিন্তু "পূজা" বা "প্রেম" পর্বেও সসম্মানে স্থান পেতে পারতো। ভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দুটি গান প্রতিতুলনীয়। বর্ষা ও গ্রীষ্ম যেমন ঋতুর দিক থেকে পরস্পর বিপরীত, তেমনি ভক্তির পরিস্থিতি এবং ভাববিন্যাসও দুটি গানে বিপরীত। বর্ষার গানে ঘনায়মান অন্ধকারে ভগবান এসেছিলেন ভক্তের খোঁজে; উপযুক্ত ভক্ত খুঁজে না-পেয়ে চ'লে গেলেন বুকভরা বিফল অভিসার নিয়ে; সজল হাওয়ায় র'টে গেলো মর্মান্তিক বার্তা—"ফিরবে না সে"। গ্রীষ্মের গানে ভক্ত

বেরিয়েছেন ভোরবেলায় ভগবানের সন্ধানে। অবশেষে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে পৌঁছলেন মন্দিরদ্বারে ; শুধু ভক্তহৃদয় নয়, সকল আকাশ ঈশ্বর-তৃষ্ণায় তখন কাঁপছে। কিন্তু দ্বার রুদ্ধই রইল, ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিলো না, মন্দিরে কেউ আছে কিনা তা-ও বোঝা গেলো না। গানের দোসরকে না-পেয়ে ভক্ত চ'লে গেলেন বুকভরা গানের বোঝা নিয়ে, "একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার।" লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিভাবের প্রকাশ শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি পাওয়া যায় গানেই (কেন ?) ; তাই আলোচ্য গানের শেষ পংক্তিটির যদি অর্থ করি : "একেলা (দেবশূন্য মন্দিরে, ঈশ্বরহীন জগতে) কেমন ক'রে বহিব ভক্তির ভার", তবে কষ্টকল্পনা তাকে বলা যায় না।

এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। ভক্তি খোঁজে তার উপযুক্ত পাত্রকে— ভক্তিভাজনকে ; দীর্ঘ কঠিন পথ অতিক্রম ক'রে অবশেষে কি আবিষ্কার বা উপলব্ধি করে সেই মহত্তোমহীয়ান্ সত্তাকে যাঁকে পরম সৎ-ও (absolute reality) বলা হয়েছে ? নাকি ভক্তই সৃষ্টি করেন ভগবানকে আপন অন্তর্নিহিত ভক্তিরসের উপাদান দিয়ে, যেমন ক'রে শিল্পী রচনা করেন এক অপরূপ দেবমূর্তি (Venus de Milo-র মতন) আপন অন্তর্নিহিত নবরসের উপাদান দিয়ে ? প্রেমের বেলাতেও অনুরূপ প্রশ্ন ওঠে। প্রেমিক কি হৃদয়ভরা প্রেম নিয়ে খোঁজেন প্রেমাস্পদকে, তার পরে যেন অকস্মাৎ দেখতে পান সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে কোনো তুলনাহীনাকে, এবং দেখেই এতদিনকার জ'মে-ওঠা আত্মনিবেদন-ব্যাকুল প্রেম ঢেলে দেন তার পায়ে ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে দাবী করেন যে ঐ-তুলনাহীনাকে দেখা একা তাঁরই চোখের দেখা নয়, সে-দেখার সমর্থন আছে "নিখিলের মাধুরি-রুচিতে"। এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি ? লক্ষ-লক্ষ প্রেমিক অন্তত কিছুকালের জন্য বিশ্বাস করেন যে তাঁর প্রিয়া তুলনাহীনা ; নিখিলের মাধুরি-রুচি যদি প্রত্যেকের দাবী

সমর্থন করে তবে সে-সমর্থন অর্থহীন হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ উল্টো কথা বলেছেন আর-একটি গানে : "আমারি মনের মাধুরি মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা/তুমি আমারি, তুমি আমারি"। এটা প্রেমিকের উক্তি নয়, প্রেম-দার্শনিকের উক্তি। শেষের দিকে বলছেন : "মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে/অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী"। কোনো মোহাবিষ্ট প্রেমিকের মুখে এমন কথা সহজে আসবে না, এ হচ্ছে মোহভঙ্গের পর স্মৃতিচারণ, যা কবিতারই উপজীব্য ("emotion recollected in tranquillity")। বাস্তব পরিস্থিতি বোধহয় দুই গানে বর্ণিত পরিস্থিতির মধ্যবর্তী। প্রেমিক বলবেন : তোমরা যদি আমার প্রিয়াকে সাধারণ মেয়ে মনে করো তবে করতে পারো, আমি কিন্তু তাকে রূপে-গুণে অসামান্যা ব'লে জানি (শুধু কল্পনা করি নয়), তাতেই আমি ধন্য, তাতেই আমার প্রেম সার্থক।

ভক্তির বেলাতেও কি এমনতরো কোনো রফায় আমরা পৌছতে পারি? ভগবানও কি কতকাংশে ভক্তমনের আবিষ্কৃত বা উপলব্ধ সত্য, কতকাংশে ব্যাকুল ও পরিপূর্ণ ভক্ত-হৃদয়ের অভিক্ষেপ (projection)? কোনো সহজ উত্তর নেই এ-প্রশ্নের।

তবে এইটুকু বলা যায় যে ভক্তির প্রকারভেদ আছে, রবীন্দ্র-কাব্যেই আমরা স্পষ্ট দুই প্রকার দেখি। এক, 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদার ভক্তি — যিনি তাঁর বন্ধুকে একাধারে ভয়ংকর এবং মধুর ব'লে জানেন এবং জেনেও ভালোবাসেন অনেকটা স্পিনোজার মতো। তবে স্পিনোজা তাঁর ঈশ্বরপ্রেমকে intellectual love of God আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রতিতুলনায় 'গীতাঞ্জলি' পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমকে emotional love of God বলা যায় — যে-প্রেমের পরিধিতে "মধুর তোমার শেষ যে না পাই"; কঠোরতার স্বীকৃতি যতোটুকু আছে তা পিতৃপ্রতিম স্নেহসিক্ত, নির্মম উদাসীন কঠোরতা নয়;

কল্যাণসাধনের অঙ্গস্বরূপ সে-কঠোরতা। স্পিনোজার ঈশ্বরভাবনায় সত্যের (সার্বজনীন সত্যের) এবং কাজেকাজেই বিষয়ানুসত্যের (objectivity-র) দাবী ছিলো মৌলিক। সে-সত্য অংশত যতো নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর হোক্‌, তার সমগ্র রূপটি এই "ঈশ্বর-মাতাল অনীশ্বরবাদী"র চোখে সুন্দর (মধুর নয়) ঠেকেছিলো, সেই বিশ্বজাগতিক নির্মম সত্যকে স্পিনোজা ভালোবেসেছিলেন, তাতেই তিনি human bondage থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন।

পক্ষান্তরে, 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলিতে ব্যক্ত ঈশ্বরপ্রেম নিভৃত নির্জন কক্ষের ব্যক্তিগত রসানন্দে ভরপুর ব্যাপার, অনুভূতির সত্যতা এবং পূর্ণতাই সেখানে বড়ো কথা, অনুভূত বিষয়ের সত্যাসত্য সেখানে গৌণ, অবান্তর। এই হৃদয়গত ঈশ্বরপ্রেমে নারীপ্রেমের মতো রয়েছে বাস্তব ও কল্পনার, দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমাবেশ। আলোচ্য গানে অবশ্য ভক্ত খুঁজছেন সেই ভগবানকে যিনি সর্বত্রই, মানবসমাজেও, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অভিব্যক্ত, যিনি মধুর প্রেমিক না-হ'তে পারেন, কিন্তু কঠিন কঠোর সত্য। বিফল হয়েছে সে-খোঁজা। গানটি কোন্‌ সালে লেখা আমার সঠিক জানা নেই, তবে ভাব ও ভাষা থেকে অনুমান করা যায় যে 'গীতাঞ্জলি'-পরবর্তী তথা পারবর্তী কালের রচনা, তাই প্রত্যেকটি চরণ এমন নৈরাশ্যঘন করুণরসে বাঁধা। 'গীতাঞ্জলি'-তে মন্দিরদ্বার খোলাই রয়েছে ; যদি-বা কখনো রুদ্ধদ্বারের উল্লেখ পাওয়া যায় তবে সেই সঙ্গে ভরসা অটুট যে দ্বার খুলবেই, অচিরেই খুলবে ("তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ঐগো বাজে") এবং "সাড়া তো না-পাই তার"-এর পরিবর্তে ভক্ত কবি এমন সাড়া পেয়েছেন যা বর্ষাধারার মতো তাঁর পূর্বেকার শুষ্ক হৃদসরোবরকে কানায়-কানায় ভ'রে দিলো। এ-সাড়া 'বলাকা' এবং পরবর্তী কাব্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে গেলো কেমন ক'রে ?

নারীপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক,

'গুলিয়ে ফেলা' সেখানে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের মনে আর-একটি প্রেম কম প্রবল ছিলো না—মানবপ্রেম। তার সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমকে মেলানো মোটেই সহজ হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, কারণ ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেমের সম্পর্ক সংঘাত ও বিক্ষোভের সম্পর্ক। তবে সেটা স্বতন্ত্র আলোচনা-সাপেক্ষ।

বেহায়ার মতো এ-ও কবুল করছি যে গালিবের কয়েকটি অতি সুন্দর শের-এর অর্থোদ্‌ঘাটনেও শ্রীউপাধ্যায়ের নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবাণী লঙ্ঘন করেছি—বিশেষত যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার ছিলো উদ্দেশ্য। উভয় কবিই তাঁদের নারীপ্রেমের (অনেকটা অভিজ্ঞতালব্ধ, কতকটা কল্পনা-অনুরঞ্জিত নারীপ্রেমের) উপাদান দিয়ে তাঁদের ঈশ্বরের মূর্তি রচনা করেছিলেন। কিন্তু কবিদ্বয়ের প্রেমের পরিস্থিতি এবং প্রেমাস্পদের ব্যক্তিস্বরূপ এতোই ভিন্ন ছিলো যে তার প্রতিফলন তাঁদের ঈশ্বরভাবনায় অনিবার্যরূপে, খানিকটা অজ্ঞাতসারেই, ঘটেছে।

বোহ্‌ আঁয়ে ঘর-মে হমারে, খুদা-কী কুদরৎ হৈ,
কভী হম্‌ উন-কো, কভী অপনে ঘর-কো দেখতে হৈঁ॥

এই শেরটি তো স্পষ্টতই তওয়ায়েফ্‌-প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। আমিও সেইভাবে অনুবাদ করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধে তার আংশিক উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য ছিলো একটু ব্যাপকতর বক্তব্যে পৌঁছনো। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বেশ-কয়েকটি গানে ভাবতে পেরেছেন যে ঈশ্বর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে তাঁরই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন, রাত্রিবেলা তাঁর শয্যার পাশে এসে বসলেন, "আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে", "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে" ইত্যাদি। গালিবের ঈশ্বরভাবনায় এই কল্পচ্ছবি বেখাপ, অসম্ভবও বলা যায়। আপন রূপের গরবে গরবিনী তওয়ায়েফ্‌ কোনো প্রেমিকের গৃহে পদার্পণ করেন না, প্রেমিকরাই আসেন তাঁর বাড়িতে সাক্ষ্য

মজলিশে, অথবা দু-একজন বিশেষ ভাগ্যবান ও প্রীতিভাজন হ'লে অন্ত সময়েও প্রবেশলাভ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, কোনো অসম্ভব লগ্নে পরমসুন্দর যদি অকস্মাৎ দেখা দেন তাঁর ঘরে, তবে গালিবের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত শের-এর অনুরূপই হবে, তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবেন না, অবাক বিস্ময়ে একবার তাকাবেন ঐ পরমসুন্দর, পরম শুভঙ্করের ক্ষণিকের অতিথির মুখপানে, একবার নিজের ছন্নছাড়া ঘরের দিকে। আমার ধারণা ছিলো যে, এই বক্তব্য 'দেশ'-এ প্রকাশিত ভূমিকা-সহ তিন কিস্তি অনুবাদে এবং আলোচ্য প্রবন্ধে স্পষ্ট করতে পেরেছিলাম। শ্রীউপাধ্যায়ের ভুল পড়া ও বোঝা দেখে সন্দেহ হচ্ছে হয়তো-বা পারিনি। তাই এই পত্রোত্তর।

গালিবের দাম্পত্যপ্রেমের উল্লেখ করিনি এইজন্য যে তার স্বাক্ষর গালিবের কবিতায় বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। আর স্ত্রী যদি এতোই ধর্মভীরু হন যে মদ্যপানকে ঘোরতর পাপ জ্ঞান করেন এবং পানাসক্ত স্বামীকে এতোই অশুচি বোধ করেন যে নিজের "বাসনপত্র সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখেন", তবে দাম্পত্যপ্রেম খুব গভীর বা টেঁকসই না-হবারই কথা। প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমের কথা গালিবের গজলে কোথায়? প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-পক্ষের বেদনাদগ্ধ অপ্রতিরিক্ত (unrequitted) সংরাগ, অপরপক্ষের গর্বিত অবহেলা, তাচ্ছিল্য, নিষ্ঠুরতা। খুব অল্পসংখ্যক যে-ক'টি গজলে অন্যপক্ষের অনুরাগ ও আত্মনিবেদনের কথা বলা হয়েছে, (যথা, "আমার বেদনায় তোমার আকুলতা, হায় রে হায়,/কোথায় গেলো নিষ্ঠুর তোমার স্বভাবগত অবহেলা, হায় রে হায়") সেগুলি ডোমনীপ্রেমের কবিতা ব'লেই পরিচিত।

গালিবের জীবনচরিতের আলোচনা করবার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিলো না। যে-ক'টি কথা তাঁর কাব্যের মর্মোদ্ঘাটনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে

হয়েছে তারই উল্লেখ করেছি সংক্ষেপে। পত্রের শেষে গালিবের যে-শেরটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে মূল উর্দু উদ্ধৃতিতে এবং ব্যাখ্যাতে উভয়ত শ্রীউপাধ্যায় একটু বিপথগামী হয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস। প্রথম পংক্তিটি হচ্ছে "না-করদহ্ গুনাহোঁ-কী-ভী হসরৎ-কী মিলে দাদ"; "গুনাহোঁ-কী-ভী"-কে "গুণাহোঁকো ভী" লিখেছেন শ্রীউপাধ্যায়; তাতে বাক্যের syntax পাল্টে যায় এবং স্বভাবতই অর্থবিভ্রাট ঘটে। শের-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: "না-করা পাপের দরুন যে-খেদ বা মনোপীড়ায় ভুগেছি আমি তার জন্যও একটু সাধুবাদ দিও/হে ঈশ্বর, যদি করা-পাপের জন্য শাস্তি ধার্য থাকে।" এই শের-এ পাপ না-ক'রে দণ্ড পাওয়ার কোনো কথা নেই, এবং 'দুঃসাহসই' বা কোথা থেকে আমদানী করলেন শ্রীউপাধ্যায়? আমার মনে হয় শের-এর মেজাজ ঠিক ধরতে পারেননি পত্রলেখক। গালিবের মনে পুত্রশোক যতোই গভীর থাক, এ-শের-এর মেজাজটি হালকাই, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে লঘুগুরু মিশ্রিত; উদ্দেশ্য আল্লাহ্-র সঙ্গে স্পর্ধাপূর্বক একটু witty সংলাপ, উর্দুতে যাকে বলে 'শোখী'। আলতাফ্ হুসেন হালী ভিন্ন মত ও পথের অনুজ কবি, তবে গালিবের শেষ বয়সের দরদী বন্ধু ছিলেন এবং পরে তাঁর গুণগ্রাহী জীবনীকার ও রসগ্রাহী ব্যাখ্যাতা। উক্ত শের-এর হালী-কৃত ব্যাখ্যা অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি: "যে-পাপ আমি করেছি তার জন্য যদি শাস্তি ধার্য থাকে তবে, হে ঈশ্বর যে-পাপ আমার সামর্থ্যের বাইরে ছিলো ব'লে করতে পারিনি অথচ তার জন্য খেদ র'য়ে গেছে মনে, তা-ও তোমার কাছে একটু সাধুবাদ পাক। শের-এর রচনাকৌশল বর্ণনাতীত।"

আমরা যেন ভুলে না-যাই যে গালিব উর্দু ভাষার দুরূহতম ও সূক্ষ্মতম কবি। তাঁর বেশ-কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট শের-এর মর্মস্থলে পৌঁছবার কোনো সহজ পথ নেই, পথকষ্ট স্বীকার করতেই হয়। তবে পৌঁছলে সব কষ্টই সার্থক হয়, পরিশ্রমী সহৃদয় পাঠক ধন্য হন। গালিবের দুরধিগম্য অনেক-ক'টি শের আমার অনুবাদ-

গুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করেছি, কাজেই অনেক জায়গায় ব্যাখ্যা ও বিস্তারের প্রয়োজন বোধ করেছি উর্দু কাব্যরীতিতে এবং এই মুশ্‌কিল-পসন্দ্‌ কবির শব্দকৌশলে অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে। পক্ষান্তরে, গালিবের গজলে এমন শের-এর সংখ্যাও কম নয় যা সারল্যের গুণেই সমুজ্জ্বল। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি জনপ্রিয় শের উদ্ধৃত করি : "আয়ুর মেয়াদ আর দুঃখের বন্ধন আসলে তো একই,/মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে কেমন ক'রে?" (কয়েদ-এ হয়াৎ ও বন্দ্‌-এ গম অসল্‌-মেঁ দোনোঁ এক হৈঁ,/মওৎ-সে পহ্‌লে আদমী গম-সে নজাৎ পায় কিয়ূঁ।)

দেখছি এ-পত্রনিবন্ধে গালিব বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনেক কথা ব'লে ফেলেছি। সোজা পথে হোক, ঘুর পথে হোক, রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে যাই ঠিকই। তার পরে? মুজতবা আলীর মুখে শোনা একটি গল্প বলি। ছোটো ছেলেকে নামতা মুখস্থ করানো হচ্ছে। এক সময়ে অন্যমনস্কভাবে সে উচ্চৈঃস্বরে ব'লে চললো— একং, দশং, শতং, সহস্রং, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ছেলে, পিলে, জ্বর, সর্দি, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী, কচুরী, শিঙাড়া, পানতোয়া (এই লাইন থেকে আর সরতে চায় না ছেলেটা), রসোগোল্লা, রসমালাই, চমচম, প্রাণহরা, ইত্যাদি। আমারও হয়েছে সেই দশা। রবীন্দ্রনাথে পৌঁছলে অন্যত্র চ'লে যেতে সরে না মন, "তোমার দুয়ার পাশারে আমি যাই যে হারায়ে।"

কবিজীবনী

মির্জা আসদুল্লাহ খাঁ গালিব

গালিবের কাব্য যদি নিরবধিকাল আর বিপুলা পৃথিবীতে সহানুভবের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকে, কবিও কি আর সমানধর্মাকে পাবেন না? অবশ্য দোষে-গুণে প্রতিভায়-অপদার্থতায়, অহঙ্কারে-দীনতায়, সাহসে-কাপুরুষতায় এই মানুষটিকে আজ সম্পূর্ণ বুঝে-ওঠা সহজ নয়। তা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম পাদের উর্দু কাব্যজগৎ থেকে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদের বাংলা কাব্য-জগতের দূরত্বও তো বড়ো কম নয়।

মির্জা নওশা ওরফে আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের জন্ম আগ্রায় মাতুলালয়ে ১৭৯৭ সালে। শৈশব কেটেছে নানা স্থানে। তুর্কী ভাগ্যসন্ধানী কওকান বেগ ছিলেন তাঁর পিতামহ। দিল্লী এসে বাদশাহ শাহ আলমের ঘোড়সওয়ার দলে ৫০ ঘোড়ার অধিনায়ক হ'য়ে যোগ দিয়েছিলেন। পিতা-পিতৃব্য পর্যন্ত সমরকন্দের এই সৈনিক-ঐতিহ্য বজায় ছিলো। কিন্তু আমাদের এই তরুণ তুর্কীর জীবন বলতে গেলে শুরুই হয়েছে, পেনশনভোগী হ'য়ে, সম্ভবত এর ফলেই ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করেছেন সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও। পিতা আবদুল্লাহ বেগ খাঁ যখন আলোয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান তখন তিনি শিশুমাত্র। পিতৃব্য নসরুল্লাহ বেগ খাঁর আকস্মিক মৃত্যুকালেও তিনি ছিলেন নাবালক। এর পরই পারিবারিক জায়গীর ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে পেনশন বরাদ্দ করেন। এই অনাথ বালকের ভাগে পড়লো বছরে সাতশ' টাকা। অর্থাৎ কাঞ্চন-কৌলিন্যের তলানিটুকু মাত্র এসে তাঁর কপালে ঠেকেছিলো। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁর অভিভাবক হয়েছিলেন মাতামহ।

আসাদ এই সময়টায় আগ্রায় চ'লে আসেন। মাতামহ শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে দৌহিত্রকে অবহেলা করেননি। মকতবে যখন পড়েন সেই ন-দশ বছর বয়সেই তিনি মুখে মুখে শের রচনা ক'রে সকলকে অবাক ক'রে দিতেন। ফারসী ভাষার একজন পণ্ডিত আবদুস সামাদ ইরাণী ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। ইনি তখন আগ্রায় থাকায় এঁর কাছেই ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নেবার সুযোগ পেলেন কিশোর আসাদ। এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। প্রাচীন ও আধুনিক ফারসী সাহিত্যের বিরাট সম্পদ মেলে ধরলেন গুরু, একটি উৎসাহী শিষ্য পেয়ে। পরবর্তীকালে গালিব এঁর ঋণ বার-বার স্বীকার করেছেন। সাহিত্যপাঠের সঙ্গে-সঙ্গেই উর্দু ও ফারসীতে মৌলিক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিলেন এই কিশোর। প্রথম যুগে তখল্লুস (penname) হিসাবে "অসদ" ব্যবহার করতেন, পরিণত বয়সে "গালিব" তখল্লুসটিই ব্যবহার করেছেন বেশি। কিন্তু তাঁর পারিবারিক নাম, "মির্জা নওশা" মোটেই পছন্দ ছিলো না।

তেরো বছর বয়সে যখন দিল্লীর অভিজাত লোহারু কুলের উমরাও বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো তখন কিশোর কবির প্রাণে প্রেমের কোনো স্পর্শ লেগেছিলো কিনা জানি না। কিন্তু সে-ঘটনার বর্ণনায় পরে রসবোধের পরিচয় যতোটা দিয়েছেন, স্নেহের পরিচয় ততোটা নয়। লিখেছিলেন, "সাত রজব ১২২৫ কো (৯ আগস্ট ১৮১০) মেরে বাস্তে হুক্মে-দওয়াম-এ-হবস্ সাদির হুয়া। এক বেড়ী যানী বীবী মেরে পাওঁ-মেঁ ডাল দী অওর দিল্লী শহর-কো জিন্দান মুকররর্ কিয়া অওর মুঝে উস জিন্দান-মেঁ ডাল দিয়া।" অর্থাৎ: সাত রজব ১২২৫ (৯ আগস্ট ১৮১০) তারিখে আমার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধান হ'লো। একটি বেড়ি অর্থাৎ বীবী আমার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হ'লো আর দিল্লী শহরকেই কারাগার সাব্যস্ত ক'রে আমাকে সেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'লো।" রসিকতা হিসাবে বেশ। তবে পরিণয় বা পরিণীতা সম্বন্ধে

কিশোরের মনে যদি কোনো রঙ লেগে থাকে তা প্রৌঢ়ের জবানীতে শুনতে ভালই লাগতো। যাই হোক, এই পরিণয়ের ফলেই তিনি রাজধানীতে এসে বসবাস শুরু করলেন কয়েক বছর পর থেকে। তখন তাঁর বার্ষিক একটা পেনশন ছিলো, শ্বশুরের কাছ থেকে এবং মাতুলালয় থেকেও মাঝে-মাঝে অর্থসাহায্য আসতো। তাই নির্জলা শের-শায়রি নিয়ে কারাবাস যে খুব দুঃখে শুরু হয়েছিলো এমন তো মনে হয় না।

গালিব যখন দিল্লীতে বাস করতে এলেন মোগল সাম্রাজ্য তখন ভেঙে পড়েছে। শাহ আলম গত হ'য়ে তাঁর পুত্র আকবর শাহ (দ্বিতীয়) তখন নামমাত্র বাদশাহ হয়েছেন। এদিকে মারাঠাদের সরিয়ে দিয়ে ততোদিনে দিল্লীর রাজদরবারে পুতুলখেলার সূত্রধর হয়েছেন ইংরেজ। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর মাসিক দশ হাজার টাকা বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন মোগল বাদশাহর জন্য। জগৎবিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পদ-বৈভব সবই ততোদিনে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে। প'ড়ে রয়েছে শুধু অসংখ্য বেগম, বাদশাজাদা আর বাদশাজাদীর অক্ষম বিলাসব্যসন, কলহ-বিবাদ, ষড়যন্ত্র, হানাহানি। সাম্রাজ্যের এই উত্তরাধিকার নিয়ে আকবর শাহ-এর পুত্র বাহাদুর শাহ জফর, উর্দু সাহিত্যে যিনি কবি জফর নামে পরিচিত, সিংহাসন পেলেন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাজত্ব করার তো কিছু ছিলো না। লালকেল্লার মধ্যেই তাঁর রাজত্ব। পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক অনটন, ইংরেজের অপমান —সব-কিছু ভুলে সাহিত্যেই তাঁর সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন এই সূফী-স্বভাবের সম্রাট। কাব্যরচনার ঝোঁক ছিলো, যা-কিছু রচনা করতেন তা আবার কুশলী কোনো কবিকে ওস্তাদ মেনে তাঁকে দিয়ে শুধরে নিতেন। সর্বপ্রথমে শাহ নসীর সম্রাটের ওস্তাদ ছিলেন। তারপর বহুকাল ছিলেন কবি জওক, জওকের মৃত্যুর পর হলেন গালিব। সেটা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রৌঢ় কবির কাছে

এর সম্মান হয়তো-না কাম্য ছিলো, মাসোহারাটা ছিলো তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। শুধু বাদশাহ নয়, কবিযশঃপ্রার্থী সকলেই সে-কালে প্রথিতযশা কবিদের কাছে নিজের রচনা পেশ করতেন ঘ'ষে-মেজে দেবার জন্য। গালিব নিজে কিন্তু সেটা কখনই করেননি, যদিও তাঁকে ওস্তাদ মেনেছেন অনেকেই।

এ-দেশে ফারসীতে যাঁরা কাব্যরচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমীর খুসরু ছাড়া আর কাউকেই গালিব ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। ফৈজী সম্বন্ধে বলতেন, "হাঁ। ওঁর কিছু-কিছু লেখা ভালোই।" কাতিল কিংবা ওয়াকিফকে তো পাত্তাই দিতেন না। কলকাতায় এসে এক মুশায়রায় ফারসী শের পড়লেন। একটা শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে কেউ-কেউ কাতিলকে অথরিটি মানলেন। গালিব নাক তুলে বললেন, "আমি ঐ ফরিদাবাদের দিওয়ালী সিং ছত্রীর কথা মানবো? আসুক কোনো জাত ইরাণী, সে যদি বলে আমার ভুল হয়েছে তবে মানতে রাজি আছি।" কাতিল মুসলমান হবার আগে দিওয়ালী সিং ছত্রী নামেই পরিচিত ছিলেন। গালিবের এই রূঢ় ভাষণের বিরুদ্ধে তখন কলকাতার উর্দু সাহিত্যিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো। এই নগরের সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তেমন মধুর হয়নি। পরবর্তীকালে কাতিলের সমর্থকদের সঙ্গে দিল্লীতেও তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে।

অহংকারের জন্যই হোক বা আত্মবিশ্বাসের জন্যই হোক গালিব কাউকে গুরু ব'লে শরণ নেননি। সম্ভবত মনে-মনে বেদিলকে গুরু ব'লে মেনেছিলেন কিছুকাল। পঁচিশ বছর বয়স হ'তে-না-হ'তেই হাজার দুয়েক শের "বেদিল"-এর ভঙ্গীতে রচনা ক'রে ফেলেছিলেন, নানা মুশায়রা উপলক্ষ্যে। তার কিছু-কিছু শুনে মীর তকী মীর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন: "অগর ইস লড়কে-কো কোঈ কামিল (সিদ্ধহস্ত) উস্তাদ (গুরু) মিল গয়া অওর উস-নে ইসে সীধে

রাস্তে পর ভাল দিয়া তো লাজবাব (অতুলনীয়) শায়র (কবি) বনেগা, বরনা (নয়তো) মোহমল (অর্থহীন) বকনে লগেগা।" মীরের শর্ত পূরণ না-ক'রেই গালিব তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করেছিলেন।

গুরু না-থাকলেও সাহিত্যিক বন্ধুর অভাব ছিলো না গালিবের। এবং কবিতা বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ মোটেই অগ্রাহ্য করতেন না তিনি। মনে হয় এঁরাই তাঁকে সিধে রাস্তায় এনেছিলেন। আজ যে নাতিবৃহৎ 'দীবান-এ-গালিব' (গালিবের কাব্যসমগ্র) পাওয়া যায় সেটি সংগ্রহ করার সময় নির্মম হাতে শত-শত শের নাকি কেটেছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন, বিশেষ ক'রে একজন বিদগ্ধ বন্ধুর নির্দেশেই। তবে সমসাময়িক যতো খ্যাতনামা কবি ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ সম্বন্ধেই গালিবের তেমন উঁচু ধারণা ছিলো না। আসলে সেকালের কাব্যরীতির সঙ্গেই তাঁর কাব্যিক মেজাজের মিল ছিলো না। সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ তখন দরবারী সাহিত্যেও পড়েছে ; চটকদার শব্দ, অলঙ্কারের বাহুল্য আর মেকী আবেগের আতিশয্য তখন মুশায়রার আসর জমিয়ে রেখেছিলো। এর মাঝখানে হঠাৎ গালিবের শের-এ যে বলিষ্ঠ সততা প্রকাশ পেলো তা ছিলো অনাস্বাদিতপূর্ব। অবশ্য গালিবেও উর্দু কাব্যের স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্যের অভাব নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে সত্যভাষণ। অন্য কারুর কাব্যেও এই গুণের পরিচয় পেলে গালিব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতেন। জওকের কবিকর্মকে তিনি তেমন উঁচুদরের মনে না-করলেও অন্তত তাঁর দু-একটি শের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। কোনো মুশায়রায় জওকের মুখে এই শেরটি শুনে নাকি লাফিয়ে উঠেছিলেন :

অব তো ঘবড়া-কে য়েহ কহতে হৈঁ কি মর জায়েঙ্গে
মর-কে-ভী চৈন ন পায়া তো কিধর জায়েঙ্গে॥

[এখন তো অস্থির হ'য়ে বলি ম'রে যাবো/ম'রেও যদি শান্তি না-পাই তবে

কোথায় যাবো।] কোনো শের ভালো লাগলে গালিব প্রশংসায় কার্পণ্য করতেন না। একবার মোমিনের একটি শের শুনে নাকি বলেছিলেন, "আমার সম্পূর্ণ 'দীবান' তুমি নিয়ে নাও আর তার বদলে ঐ-শেরটি আমায় দিয়ে দাও।" আমাদের কাছে হয়তো প্রস্তাবটি একটু বেশি বেহিসাবী মনে হবে, গালিবের প্রিয় এই শেরটি শুনলে :

তুম মেরে পাস হোতে হো গোয়া
জব কোঈ দূসরা নহীঁ হোতা।

[তুমি যেন আমার কাছেই থাকো/যখন আর কেউ থাকে না।]

গালিবের প্রবল আত্মবিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তাঁর নিজেকে নিয়ে ছড়া কাটায়। নিজের স্ফীত অহমিকাকে লক্ষ ক'রে বলেছেন বটে কখনও

রেখ্‌তাকে তুম-হী উস্তাদ নহীঁ হো গালিব
কহতে হৈঁ অগলে জমানে-মেঁ কোঈ মীর-ভী থা।

[উর্দুর শুধু তুমিই ওস্তাদ নও গালিব/লোকে বলে সে-কালে মীর* ব'লেও কেউ ছিলেন।] অবশ্য সেই সঙ্গে এ-বিষয়েও তিনি যথেষ্ট নিঃসন্দিগ্ধ যে

হৈঁ অওর-ভী দুনিয়া-মেঁ সুখনবর বহুৎ অচ্ছে।
কহতে হৈঁ কেহ্, গালিব-কা অন্দাজ-এ বয়াঁ অওর।

[দুনিয়াতে খুব ভালো কবি আরও আছেন/লোকে বলে গালিবের বলার ভঙ্গিই আলাদা।] তবে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যতোটা সচেতন নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধেও তার চেয়ে কম নয়। তবু যেন সস্নেহেই বলছেন নিজেকে :

ইশ্‌ক্‌-নে গালিব নিকম্মা কর দিয়া
বরনা হম-ভী আদমী থে কাম-কে।

* ইনি মীর তকী মীর নন।

[ভালোবাসাই, গালিব, নিষ্কর্মা ক'রে দিলো/নয়তো আমিও কাজের লোক ছিলাম ॥] তাছাড়া রয়েছে সেই বিখ্যাত শের :

য়েহ্ মসাইলে তসব্বুফ, য়েহ্ তেরা বয়ান গালিব,

তুঝে হম বলী সমঝতে জো ন বাদহ্খ্বার হোতা ॥

[এইসব মরমিয়া দার্শনিক সমস্যার এমন তোমার ব্যাখ্যান গালিব,/তোমাকে আমি সন্ত মনে করতাম, যদি-না তুমি মদ্যপ হ'তে ॥] অবশ্য যতো নিন্দা, যতো কলঙ্কই থাক-না গালিবের, তাঁর নিজের জন্য সান্ত্বনার অভাব নেই :

গালিব, বুরা ন মান জো বাইজ বুরা কহে,

এ্যায়সা-ভী কোঈ হো কি সব অচ্ছা কহেঁ জিসে ॥

[গালিব কিছু মনে ক'রো না যদি ধর্মোপদেষ্টা তোমাকে মন্দ বলেন/এমন-কি কেউ আছে যাকে সবাই ভালো বলে ॥]

মানুষটা আজকের মধ্যবিত্ত মাপে সত্যিই বেশ বেঢপ। সমস্ত পরিণত বয়সটা তাঁর দারুণ অর্থকষ্টে কেটেছে, অথচ নিয়মিত অর্থোপার্জনের কোনোই উদ্যম ছিলো না তাঁর। এই দরবারে সেই দরবারে, এমন-কি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারেও প্রশস্তি লিখে পাঠাচ্ছেন নগদ-বিদায়ের আশায়। একে-তাকে ধ'রে তদবির করাচ্ছেন। বার্ষিক যে সরকারী পেনশন পাচ্ছিলেন তা-ও পারিবারিক বিবাদ-বিদ্বেষের ফলে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। জীবনের বহু বৎসর ব্যয় করেছিলেন পুনর্বার সেই পেনশনের অধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টায়। তার জন্যেই দিল্লী থেকে কলকাতার এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রেও এসেছিলেন। আকণ্ঠ নয়, আমস্তক ঋণে ডুবে ছিলেন — তার জন্য আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছিলো মাথার ওপর। বাড়ি থেকে বার হ'তেন না, পাছে গ্রেফতার হন। ঋণের দায়ে কারাদণ্ড হ'লেও নাকি সেকালে অভিজাত ব্যক্তিদের স্বগৃহ থেকে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'তো না। তবু কারাবাস তাঁর নির্বন্ধ ছিলো। জুয়া-

খেলার অপরাধে তিন মাস কারাবাস করেছিলেন। এই অপমান তাঁর এতোদূর বেজেছিলো যে এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন : "মৈঁ হর এক কাম খুদা-কী তরফ-সে সমঝতা হুঁ, অওর খুদা-সে লড় নহীঁ সকতা।...মেরী য়েহ আরজু হৈ কি অব দুনিয়া-মেঁ ন রহুঁ, অওর অগর রহুঁ তো হিন্দোস্তান-মেঁ ন রহুঁ।" এদিকে সর্বস্বান্ত দেউলে, ওদিকে রমজানের সময়েও জুয়াখেলা, মদ্যপান ইত্যাদির জন্য অনুরাগী ভক্তরাও তিরস্কার করছেন। অথচ কোনো-কোনো ব্যাপারে প্রচণ্ড আত্মাভিমান। ১৮৫২ সালে দিল্লী কলেজে ফারসীর প্রধান অধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় বন্ধুদের উৎসাহে গালিব সেই পদের জন্য প্রার্থী হলেন। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব মিঃ টম্পসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন পালকী চেপে। টমসন সাহেব কবির পূর্বপরিচিত। কিন্তু সাহেব যেহেতু চাকুরীপ্রার্থী গালিবকে অন্যদিনের মতো সেদিনও এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাননি এবং নিজের অফিসে ব'সে তাঁর অপেক্ষা করেছিলেন, তাই গালিবও তাঁর সঙ্গে দেখা না-ক'রেই ফিরে গেলেন। কারণ চাকরী তো এইজন্য নেওয়া যে কিছু সম্মানলাভ হবে, কিন্তু চাকরী হবার আগেই যদি এইভাবে সম্মানলাঘব হয় তবে আর তা দিয়ে দরকার কী? এদিকে আত্মসম্মানবোধ টনটনে অথচ ওদিকে গ্রাসাচ্ছাদন আর মদ্যপানের জন্য খাতকদের লাঞ্ছনা সহ্য করছেন।

ভারতীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গালিব। কিন্তু ইতিহাসের বড়ো-বড়ো ঘটনা যখন ঘটে, প্রলয়ের তাণ্ডব যখন চলতে থাকে তখন কতো অসংখ্য মানুষ নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বটুকু নিয়েই এতো বিব্রত থাকেন যে ঘটনাগুলি যেন তাঁদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়। সে-সব ঐতিহাসিক নাটকে তাঁদের না-থাকে কোনো ভূমিকা, না তাঁরা অনুভব করেন এই ঘটনাগুলির সুদূর কোনো তাৎপর্য। গালিবের জীবনে সিপাহী

বিদ্রোহ এমনই একটা ঘটনা। ইতিপূর্বে শুনেছি বটে যে সিপাহী বিদ্রোহ কলকাতার জীবনেও কোনো ছায়াপাত করেনি সে-সময়ে কিংবা বাঙালীরা সাধারণভাবে এই বিদ্রোহ থেকে দূরেই ছিলো এবং ইদানীংকালে এ-ও সবারই জানা যে আমাদের কোনো-কোনো ইতিহাস-পণ্ডিতের মতে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দোলনের মর্যাদাও দেওয়া সমীচীন নয়। তবু এই যে হঠাৎ একটি মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো যিনি ১৮৫৭ সালের ১১ই মে যে-দিন বিদ্রোহী সিপাহীরা মীরাট থেকে দিল্লীতে এসে পৌঁছেছিলো সে-দিন দিল্লীতে সরেজমীন উপস্থিত ছিলেন, বিদ্রোহ বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গী বেশ বিস্ময়কর। অথচ ঐ উল্লিখিত নাটকের কুশীলবদের মধ্যে অন্যতম, বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জফর-এর তিনি তো তখন ছিলেন ওস্তাদ অথবা কাব্যগুরু— শায়র-উল-মুল্ক অর্থাৎ পোয়েট লরিয়েট। তিনি নিজেই এক বন্ধুকে ১৮ মাস পরে এক পত্রে লিখেছিলেন : "১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে যে-দিন দিল্লীর হাঙ্গামা শুরু হ'লো সে-দিনই আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিতে বললাম এবং বাইরে যাওয়া-আসা একেবারে ছেড়ে দিলাম।" কবিকে কেউ বীরপুরুষ হ'তে বলে না এবং প্রলয়কালেও গজদন্তমিনারে বাস করার তাঁর অধিকার আমরা কেউ-কেউ হয়তো স্বীকার করবো, তবু এই শম্বুকনীতি মনে হয় শিল্পীর নির্লিপ্ততা নয় ; এ ভয়তাড়িত বিভ্রান্ত মানুষের অসহায়তা। ইংরেজদের প্রতি তাঁর যতোই ভরসা ও শ্রদ্ধা থাক, ঘটনার গতি কোন দিকে যাবে তা ঠিক ঠাহর করতে না-পেরে সম্ভবত আত্মরক্ষার জন্য উভয় পক্ষ থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন গালিব। মন দিয়েছিলেন পুরোনো কবিতা ঘষা-মাজায়,নইলে মানুষ দিন কাটাবে কী ক'রে এই শহরভরা উত্তেজনা, অরাজকতা, নৃশংসতা আর অভাব অনটনের মাঝখানে? তাছাড়া দিনলিপি লিখতে শুরু করেছিলেন প্রাচীন ফারসীতে, যেন চট ক'রে কেউ বুঝতে

না-পারে কী লিখছেন—যদি হঠাৎ কোনো পক্ষের হাতে পড়েন। এর নাম দিয়েছিলেন "দস্তাম্বু"—অর্থাৎ এক গুচ্ছ ফুল—নাম শুনে কবিতাই মনে হবে। তৈমুরবংশের ইতিহাস রচনার জন্যও রাজদরবার থেকে মাসোহারা পাচ্ছিলেন, তাই সেটিও লিখে চলেছিলেন। "দস্তাম্বু"তে এক জায়গায় লিখেছিলেন, "যতোটুকু লিখলাম তাতে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে, যা লিখলাম না তাতে আত্মা পীড়িত হচ্ছে।" এই একটি বাক্যেই চিনতে পারা যায় দ্বিধাদীর্ণ অসহায় বুদ্ধিজীবিটিকে। ব্যক্তিগত ও দেশজোড়া সর্বনাশের মধ্যে কোনোরকমে নিজের শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি তখন চেষ্টা করছেন।

বিদ্রোহ দমিত হবার পর রাজধানীতেও শ্মশানের শান্তি ফিরে এলো। একে-একে আত্মীয়-বন্ধুদের মৃত্যু ও অন্যবিধ নিগ্রহের সংবাদ আসতে লাগলো। প্রথম দিকে মুসলমানরা রাজধানীতে ফিরে আসার অনুমতি পাননি—দু-বছর পর সে-অনুমতি দেওয়া হ'লো, তাঁদের সম্পত্তিও ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো। ইতিমধ্যে আবার পেনশনের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে গালিব দেখেন তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের মনে সন্দেহ জন্মেছে যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলো। ১৮৬০ সালে গালিব এ-ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পেনশনও আবার পেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ঋণ আর অনটনের বিরাট মরুভূমিতে এই সামান্য-কিছু অর্থ তো কয়েক বিন্দু জল। অভাবের তাড়নায় বার-বার রামপুরের নবাবের কাছে কাতর ভিক্ষা জানিয়েও কেবলমাত্র মাসিক একশ টাকা ছাড়া আর-কিছু পাননি। এদিকে অসুস্থ এবং সংসারভারগ্রস্ত গালিব আরো-এক অশান্তির মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ কয়েকটি বছর অপমানে-অসম্মানে কালো হ'য়ে গেলো।

প্রচলিত ফারসী শব্দকোষ "বুরহান-ই কাতে"—পুস্তকটিতে বহু ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ ক'রে সে-সব সংশোধন ক'রে "কাতে-ই বুরহান" নামে প্রকাশ করেন

১৮৬২ সালে। তাতে যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। গালিব তাঁর সমসাময়িক আর কোনো ভারতীয়ের চেয়েই যদিও কম ফারসী জানতেন না তবু এ-বিষয়ে তিনি কোনো স্বীকৃতি পাননি। সে-জন্ত তাঁর মনে দুঃখ ও তিক্ততা কম ছিলো না। এবার এলো অপমান। শব্দকোষটি প্রকাশ হবার পরেই গালিবের বিরুদ্ধে রাশি-রাশি পুস্তিকা লেখা হ'তে লাগলো। তার অনেকগুলিই নির্জলা গালিগালাজ। পাতিয়ালার মিয়া আমিনুদ্দীন যে-পুস্তিকাটি লিখলেন তাতে অরুচিকর গালাগাল এবং জঘন্ত ইঙ্গিত শালীনতার সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছিলো। গালিব অনেক সহ্য করেছিলেন, এবার রাজদ্বারে মানহানির মামলা আনলেন। তখন প্রতিদিন অসংখ্য বেনামী চিঠি আসতে লাগলো কুৎসিত ভাষায়। আদালতে মিয়া আমিনুদ্দীনের পক্ষ থেকে মস্ত-মস্ত মৌলভীরা গেলেন; দিল্লী কলেজের আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপক ইংরেজ বিচারপতিকে বুঝিয়ে দিলেন যে মিয়া আমিনুদ্দীন মিথ্যা কথাও কিছু লেখেননি, নাহক গালিও দেননি; গালিবের মতো পানাসক্ত ব্যক্তিকে আগ্রার কলল* বলায় কিছুই বাড়িয়ে বলা হয় না, ইত্যাদি। কুৎসাপ্রচারে এই দলের ঔদ্ধত্য যে-পর্যায়ে পৌঁছেছিলো তাতে বিচলিত হ'য়ে গালিব মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্বেষের তীব্রতা ও নিন্দুকের নিষ্ঠুরতা তাতে কমেনি। ঠিক এই সময়ে তাঁর প্রিয় সুহৃদ এবং জীবনীকার হালীও একটি অবিবেচনার কাজ ক'রে ফেলেছিলেন যার জন্ত তিনি চিরজীবন লজ্জাবোধ করেছিলেন। ঘটনাটি গালিবকে বুঝতে আর-একটু সাহায্য করবে। হালীর জবানীতেই বলা যাক: "আমার তখন খুব ধর্মোন্মত্ত আত্মতুষ্ট ভাব ছিলো মনের। আমি ভাবতাম আল্লার দুনিয়ায় কেবলমাত্র মুসলমানেরা, মুসলমানদের তিয়াত্তরটি

* কলল-রা নিম্নবর্গের লোক, মদ চোলাই ও বিক্রয় তাদের জীবিকা।

সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্নীরা, আবার সুন্নীদের মধ্যে হানাফীরা আর হানাফীদের মধ্যেও কেবল তারাই আল্লার রহম (করুণা) এবং নজাৎ (মুক্তি) পাবে যারা রোজা নামাজ হজ ইত্যাদি অবশ্যকর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে পালন করে – যেন আল্লার করুণা যে-রাজ্যের উপর বর্ষিত হয় তা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের চেয়েও সংকীর্ণ। তাই এই মানুষটার (গালিব) জন্য আমার ভালোবাসা যতো তীব্র হ'তে লাগলো ততোই ব্যাকুল হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এঁর দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, এখনও যাতে আল্লার রহম আর নজাৎ লাভ করেন তার জন্য তো চেষ্টা করা উচিত। প্রায়ই মনে-মনে আক্ষেপ করতাম এই পণ্ডিত মানুষটার জন্য – মৃত্যুর পর তো আমাদের আর সাক্ষাৎ হবে না রিজবানের বাগিচায় (বেহেস্ত)। তাই গালিবের খ্যাতি, প্রতিভা, প্রবীণতা সব ভুলে গিয়ে তাঁকে একদিন মস্ত এক চিঠি লিখলাম উপদেশে-ভরা। আমি তখন ঐ বেনামী কুৎসিত চিঠিগুলির কথা কিছুই জানতাম না, যাতে তাঁর জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁকে অকথ্য গালাগালি করা হচ্ছিলো। আমি তাঁকে লিখলাম, পাঁচবার নামাজ পড়া আমাদের ফর্জ, তিনিও যেন বিধিমতো শুদ্ধ হ'য়ে যথাসাধ্য তা পালন করেন···ইত্যাদি। আমার এই চিঠি পেয়ে গালিব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমার নিবোধ পত্রের উত্তরে গালিব যা বলেছিলেন, তা মনে রাখার মতো। গালিব বলেছিলেন, 'আমার সারাটা জীবনই তো পাপকর্মে, অপকর্মে কাটালাম। আমি কখনও নামাজ পড়িনি, রোজা রাখিনি, অন্য-কোনো পুণ্যকর্মও করিনি। আর ক'দিন পরেই আমি শেষ নিশ্বাস ফেলবো। এখন আমার আর যে ক'টা দিন বাকি আছে এই দিনগুলি যদি নামাজ প'ড়েও কাটাই তবু যাবজ্জীবন পাপের কি কোনো প্রতিবিধান হবে? তার চেয়ে আমার যোগ্য শাস্তি হবে যদি আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়-বন্ধুরা আমার মুখে কালি মেখে, পায়ে দড়ি বেঁধে আমাকে

দিল্লীর পথে-পথে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে আসেন কাক-চিল-কুকুরের জন্য — যদি অবশ্য তাঁরা এই অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করতে রাজি হন।' "

অবশেষে ১৮৬৯ সালের ১৫ইফেব্রুয়ারী মৃত্যু এসে সব লাঞ্ছনা, সব দৈন্য, সব শারীরিক যন্ত্রণার অবসান ঘটালো। মৃত্যুর আগে কয়েকদিন বার-বার অচেতন হ'য়ে পড়ছিলেন, মাঝে-মাঝে অল্পক্ষণের জন্য চেতনা ফিরে আসছিলো। হালী গিয়ে দেখেন চেতনা-অচেতনার দোলায় দুলতে-দুলতেই গালিব নবাব আলাউদ্দীন আহমেদ খানকে একটা চিঠির উত্তর লেখাচ্ছেন : " 'আমি কেমন আছি কেন জিজ্ঞেস করছেন ? দু-একদিন অপেক্ষা ক'রে আমার প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করবেন।' তারপর সাদীর একটি শের উদ্ধৃত ক'রে বললেন, 'আপনি তো আমায় দেখতে আসতে পারলেন না, বেশ, খুদা হাফিজ।' "

জনাজাতে (শোকযাত্রা) শিয়া-সুন্নী দুই সম্প্রদায়েরই বহু লোক গিয়েছিলেন। গণ্য-মান্যের অভাব ছিলো না। দফনের আয়োজন শুরু হবার পূর্বমূহূর্তে শিয়া সম্প্রদায়ের একজন মুখপাত্র এগিয়ে এসে বললেন, "গালিব শিয়া ছিলেন, তাই যদি অনুমতি করেন তো আমাদের প্রথা অনুযায়ীই সব কাজ করি।" কিন্তু নবাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ সে-কথা কানেই তুললেন না। সব অনুষ্ঠান সুন্নী মতে হ'লো। হালী লিখেছেন, "কতো ভালো হ'তো যদি শিয়া-সুন্নী দু-পক্ষই সে-দিন জনাজার নামাজ পড়তেন, গালিব তো দুই সম্প্রদায়কেই সমান জ্ঞান করতেন।"

গালিবের জন্য যে বিশ্বের কোনো কাজই আটকে থাকবে না, তাই তাঁর মৃত্যুতে শোক করবার কিংবা অঘোরে কাঁদবার কোনো প্রয়োজন নেই সে-কথা তিনি নিজেই ব'লে গেছেন :

গালিব-এ খস্তা কে বগৈর কওন-সে কাম বন্দ হৈ।
রোইয়ে জার-জার ক্যা, কীজিয়ে হায় হায় কিঁউ ?

কিন্তু এতোখানি প্রতিভাধর একটি মানুষের জীবন আর-একটু কম যন্ত্রণাময় হ'লে বিধাতার কী ক্ষতি হ'তো ?

—